জানুয়ারি সংখ্যা, ২০২৩

মুক্তচিন্তক মাসিক পত্রিকা

প্রকাশিত

চেতনার অন্বেষণে



বইমেলা

অশোক দাস চার্বাক

অলৌকিক নয়, লৌকিক

মহম্মদ মহসীন

সংগঠিত ধর্ম কোনোদিন ডারউইনকে পছন্দ করেনি

শম্ভুনাথ চার্বাক

ধ্বংসের বোপীত বীজ ও শেষের অপেক্ষা

রাহুল রায়

শিশুমন, কুসংস্কার ও অঙ্গীকার

তন্ময় দাশগুপ্ত

ধর্ম বিশ্বাসী মাত্রই কি সুখী?

বিশ্বজিৎ চৌধুরী

চেতনা

বিপ্লব সেন

বি শে ষ সং যো জ ন:

The Political Discussions Around One Word.. Hindutva and Indianness

- Gouri Lonkesh

যুক্তিবাদীরা কর্তৃক প্রকাশিত

চেতনার অন্বেষণে

| মুক্তচিন্তক মাসিক পত্রিকা
| জানুয়ারি সংখ্যা, ২০২৩

প্র কা শ না

যু ক্তি বা দী রা

প্র কা শ সং খ্যা

তে ই শ

যো গা যো গ

yuktibadira@gmail.com
WhatsApp-9433794113
Telegram:@Yuktibadira
Fb/rationalistsmag
Insta/rationalists_mag
Twitter/yuktibadira
Website:rationalists

ক ল কা তা - ৫ ৬

বি নি ম য় মূ ল্য না ই

সূ চি

প্র ব ন্ধ - নি ব ন্ধ:

ক বি তা:

বি শে ষ সং যো জ ন:

পিডিএফ পড়ার ভালো এক্সপেরিয়েন্সের জন্য অডোবি রিডার, মুন রিডারের মত অ্যাপ ব্যবহার করুন।

যে লেখাটি পড়তে চান সূচিপত্রে সেই টাইটেলটিতে ক্লিক করুন।

প্রতিটি লেখার ওপরে সূচিপত্র বাটন পাবেন তা ক্লিক করে সূচিতে ফেরত আসতে পারবেন।

ড্রাইভ পিডিএফ ভিউয়ার অ্যাপে এই ফিচার কাজ করবে না।

মুক্তচিন্তক সম্মাননা

মুক্তচিন্তা নিয়ে বিগত সংখ্যা অবধি যাঁরা পাঁচটি বা তার অধিক লেখা দিয়েছেন, তাঁদের সম্মানজ্ঞাপক একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করছি। পাঁচটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রটি প্রদান করা হতে থাকবে আগামীতেও। যাঁদের দৃপ্ত লেখনীতে ‘চেতনার অন্বেষণে’র পাঠক ঋদ্ধ হয়ে চলেছে।

এমাসে সংর্বধনা জ্ঞাপন করছি



পার্থ সারথি চন্দ্র মহাশয়কে।

তাঁর লেখার সাথে আমরা পরিচিত, শিক্ষকতা করেন।

আমাদের অসাধারণ লেখা উপহার দিয়ে চলেছেন।

মুক্তচিন্তকদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই।

সম্পাদকীয়

গতমাসের সংখ্যাটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে পাঠকের কাছে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে ‘চেতনার অন্বেষণে’ পত্রিকা বাংলা সাহিত্য ওয়েবসাইটে জায়গা পেয়েছে। এবং এমাসেই আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের গ্রাহক সংখ্যাও ৩০০০ হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসেই অনেকগুলি নতুন বই আপলোড করা হবে। এই ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ায় পাঠক ও লেখক দুই অংশেরই ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সবাই যেভাবে পাশে আছেন চিরকৃতজ্ঞতা জানাই। এবারের বইমেলায় অনেকের সাথেই সামনে থেকে দেখা সাক্ষাত হবে আশাকরছি।

প্রতিমাসে একটি করে বই রেকমেন্ডডেসন করা হচ্ছে এবং মাসের শেষ রবিবার বইটি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। এমাসের আলোচনায় অনেকেই জুড়েছিলেন। তাঁদের সবাইকে শুভকামনা জানাই। প্রচুর বই পড়ুন পাশাপাশি লেখালেখিও করুন।

বইমেলার ব্যস্ততা ইত্যাদির জন্য এবারের সংখ্যাটিতে একটু চটজলদি কমপ্লিট করার চেষ্টা হয়েছে। যতটা সম্ভব ত্রুটি মুক্ত করার চেষ্টা করেছি তারপরও ত্রুটি মার্জনার চোখে দেখবেন।

ASK RATIONALISTS ক্যাম্পেইনে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রশ্ন এসেছে এমাসের সংখ্যাটিতে একটি প্রশ্নই মাত্র প্রকাশ করেছি। বাকিগুলো পরের সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

এবারের সংখ্যায়, মুক্তচিন্তক গৌরী লংকেশকে স্মরণ করেছি। পাশাপাশি সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি লেখা দেওয়া হয়েছে। পুরো ম্যাগাজিনটা পড়লে নতুন কিছু শেখা ও জানার জার্নি চমৎকার হবে বলেই আশারাখি।

আবারও সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

ধন্যবাদ।

৩১, জানুয়ারি, ২০২৩

মুক্তচিন্তকদের বই ভান্ডারে আসুন -

চে ত না

অথবা টেলিগ্রামে সার্চ করুন - @Yktibadira

প্রশ্ন করুন যুক্তিবাদীদের

Ask Rationalists

আপাত অতিপ্রাকৃত ঘটনা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ঈশ্বর, ভূত, আত্মা, কোনও ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, সমাজ-রাজনীতি ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত উত্তরের খোঁজ করে থাকলে প্রশ্নটি যুক্তিবাদীদের বলুন।

প্রশ্নটিকে সংশিষ্ট বিশেষজ্ঞের কাছে পৌছে দেব, এবং উত্তর পাবেন 'চেতনার অন্বেষণে' পত্রিকার আগামী সংখ্যায়।

| প্রশ্ন করুন এই গুগল ফর্মে – Ask_Rationalists

সূচিপত্র

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা

লি খে ছে ন – কি নো ক্ষ্যা পা



আধুনিক ভারতে বিজ্ঞানচর্চা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যেসমস্ত পথিকৃৎদের নাম শুরুতেই করতে হয় তাঁদেরই একজন ছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ১৯২০-র দশকে দেশ পরাধীন থাকলেও পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান দেশ-কাল-সীমানার গন্ডি ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে সমাদর লাভ করেছিল। তখন থেকেই আরেক বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আইনস্টাইন-এর নামের সাথে উচ্চারিত হয় তাঁর নাম। তারপর থেকে “বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব”, “বোসন” কণা ইত্যাদি নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ জনমানসে আলোচনার কোনোদিনই কোনও অভাব হয়নি।

খামতি যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা এই মহান ব্যক্তির অন্যান্য বিভিন্ন গঠনমূলক চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনার খামতি। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তাঁর মূর্তি গড়া হয়েছে, তাঁর নামে প্রতিষ্ঠান তৈরী করা হয়েছে, কিন্তু সবথেকে বেশী যেটার প্রয়োজন ছিল সেটাই কখনও করা হয়নি। সেটা হল তাঁর অমূল্য চিন্তাভাবনা গুলোকে যত্নের সাথে বাস্তবায়িত করা। বিশেষত, দেশবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে যতটা গঠনমূলক ভাবে তিনি তুলে ধরেছিলেন ঠিক ততটাই অবজ্ঞার শিকার হয়েছে তাঁর এই চিন্তাভাবনা। ফলে বিজ্ঞানচর্চা তো বটেই, বরং গোটা শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই মাতৃভাষার ব্যবহার ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। এই বিলুপ্তিকে আটকানোর জন্য পদার্থবিদ্যায় তাঁর অবদানের পাশাপাশি যেটা নিয়ে আলোচনা আরও বেশী করে প্রয়োজন সেটা হল "মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা" নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা। সেরকমই একটা চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

এতবড় একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে নিদারুণ সারল্যের সাথে একজন প্রকৃত শিক্ষকের মত ছাত্রছাত্রীদের ভালোমন্দকে বুঝেছিলেন সেটা কম মানুষই পেরেছিলেন। বিদেশী ভাষা যে বিজ্ঞানচর্চার পথে আসলে প্রতিবন্ধকতা হিসাবেই কাজ করছে সেকথা তিনি অনুভব করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু-ই প্রথম এই ব্যাপারটা নিয়ে সোচ্চার হন যে ছাত্ররা এই বিদেশী ভাষায় নিজেদের মনের

ভাব ঠিকভাবে বোঝাতে পারে না। এমন কি এই বিদেশী ভাষায় পড়ানোর ফলে শিক্ষকও বুঝে উঠতে পারেন না যে ছাত্র কতটা শিখে উঠতে পারল। সত্যেন্দ্রনাথ বসু-র নিজের ভাষায় – "বিদেশী ভাষা ছাত্রদের পড়া মুখস্থ করাতে বাধ্য করে, স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ হতে দেয় না এবং সৃজনী শক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে কোন দেশেই বিদেশী ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানো হয় না, হওয়ার কোনও কারণও নেই" [২) ৯৪]। বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দেখিয়ে তিনি বলেছেন – "আমরা ইতিহাস পড়ি, রুশ, জাপান, মিশর ইত্যাদি দেশের নবজাগরণের খবর পড়ি। কিন্তু যদি বলা যায়, এসব দেশে দ্রুত প্রগতি সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞান শিক্ষা মাতৃভাষায় চালু করার ফলে এবং সেই ভাবে আমাদের দেশে শিক্ষা-নীতিতে পরিবর্তন আনলে, আমরাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলতে পারবো, তখনই তর্কের ধোঁয়ায় আসল কথা চাপা পড়ে যায়" [১) ২৭৭-২৭৮]। এমনকি আর সময় নষ্ট না করে স্নাতকোত্তর স্তরেও শিক্ষার মাধ্যম যাতে মাতৃভাষা করে দেওয়া হয় তার আর্জিও জানিয়েছিলেন তিনি। ইংরাজী শিক্ষার মোহভঙ্গ ঘটিয়ে তিনি মজার ছলে একটা ভীষণ দামী কথা বলেছিলেন – "দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের মধ্যে যেমন অনেক গৌরবময় কথা আছে, তেমনি অনেক কলঙ্কের কথাও আছে। কিন্তু সেই সকলের মূল যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহলে এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনার মূলে অনেক সময় দেখা যাবে ইংরেজী শিক্ষিত গর্বিত ও স্বার্থপর লোকের কীর্তিকলাপ" [১) ১০৮]। কথাটা আজকের দিনেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

দেশ যে শুধুমাত্র একটা ভৌগোলিক সীমানা নয়, বরং তার থেকে অনেকটা বেশী কিছু সেটা বুঝতেন বলেই দেশের কিসে ভালো হবে সেটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন – "এটা ঠিক যে দেশ বলতে যদি দেশের লোককে বুঝায়, শুধু শিক্ষিত বা নায়ক সম্প্রদায় না হয়, যদি মনে হয়, দেশের সাধারণ লোকই দেশ, তবে এরা শিক্ষিত হলেই তো দেশকে উন্নত বলা যাবে, এবং দেশকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য সমূহ শক্তিই তাদের হাতের মধ্যে থাকবে" [১) ১০৭]। তাই দেশের সাধারণ জনগণকে শিক্ষিত করার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে তিনি তুলে ধরেছিলেন মাতৃভাষাকে। শুধু বিজ্ঞান নয়, গোটা শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রয়োগ আর প্রচলন ঘটাতে না পারলে শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমন কোনও পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না বলেই তিনি মনে করতেন। এই বিষয়েও তাঁর দূরদর্শীতার পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি বলেন – "শিক্ষার্থী যদি তার পারিপার্শ্বিক জগতে নিয়ত দেখে ইংরেজীনবীশের বাজার দর বাঙলানবীশের তুলনায় অনেকগুণ বেশী, তাহলে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, সে বা তার অভিভাবকরা ইংরেজীর দিকে ঝুঁকবেই, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পারিপার্শ্বিকের এই প্রতিকূল ও বিভ্রান্তিকর প্রভাবকে দূর না করা অবধি মাতৃভাষায় সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে না" [১) ১১৫]। একথা আজ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা, বিশেষত শহুরে অঞ্চলে, আজ ঠিক এই সমস্যারই সম্মুখীন। গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেই যাতে

মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে ব্যাপারে তাঁর ধারণা ছিল – "... যে প্রথমেই আমরা সারা দেশের কথা না ভেবে যদি আমাদের নিজেদের ঘর তৈরী করি, অর্থাৎ আমরা যে প্রদেশে থাকি সেই প্রদেশের লোকের শিক্ষা এমন ভাবেই বন্দোবস্ত করি যাতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রত্যেক শিশুর কাছে পৌঁছায়, তাহলে আমাদের সামনে নতুন যে সমস্ত অসুবিধা দেখা যাচ্ছে সেটা সহজেই চলে যায়" [(১) ১০৭]। বলাই বাহুল্য যে ভারতের শাসকশ্রেণী এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ গুলোকে বরাবরই উপেক্ষা করেছে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারে যাঁরা বরাবরই নিজেদের নাক উঁচু করে এসেছেন তাঁরা নিজেদের স্বপক্ষে দুটো যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তাঁদের প্রথম যুক্তি ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার ফলে নাকি বেকার সমস্যা বাড়বে। এটা এতটাই অবাস্তব একটা কথা যে এটা নিয়ে বিস্তর আলোচনায় যাওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তাই নেই। বেকার সমস্যা বাড়া তো দূরের কথা বরং এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অনেক জীবিকা সংস্থানের উপায় হতে পারে। যেমন – মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ফলে অনুবাদে বিশেষজ্ঞ ভাষাবিদ্‌দের প্রয়োজনীয়তা বাড়বে বলেই মনে করেছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ভারতের মত বহু ভাষাভাষীর দেশে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা তথা শিক্ষাদানের একটা পরিবেশের মধ্যে অনুবাদ করার রীতি ও পদ্ধতি শেখানো হলে সেটা নিঃসন্দেহে অনেক জীবিকা সংস্থান ঘটাতে পারত। এছাড়াও, উন্নাসিকদের দ্বিতীয় যুক্তি ছিল

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথে একটা বড় বাধা। তবে এগুলো যে নিছক অজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন – "পরিভাষার প্রয়োজন ক্ষেত্র বিশেষে আছে, ঠিকই, তবে পরিভাষাকে নিমিত্ত করে শিক্ষা পরিকল্পনাকে স্থগিত রাখাও অনুচিত। ... তাছাড়া পরিভাষার উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় তার আদৌ কোন যুক্তি আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার। ... আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অনেকাংশ পাশ্চাত্য দেশ থেকে নেওয়া। তারা বৈজ্ঞানিক তথ্য, যন্ত্র বা ধারণাকে যে নামে চিহ্নিত করছে, সেই তথ্য, যন্ত্র বা ধারণাকে আমরা সেই নাম-সমেত গ্রহণ করেছি। সেই নামের প্রতিশব্দ সন্ধান করা অনেকটা টেলিফোনকে দূরভাষ যন্ত্র বলার মতই বাতুলতা। অপরের কাছ থেকে নেওয়া জিনিস অপরের দেওয়া নামেই ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়" [১) ১১৩-১১৪]। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজী শব্দ ব্যবহারে তাঁর যে কোনও আপত্তি নেই সেকথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে তিনি বলেছিলেন – "অনেক সময় বলা হয় যে, ভারতীয় ভাষাগুলিতে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব বিজ্ঞানচর্চায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আমি বিশুদ্ধবাদী নই; তাই ইংরেজী টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাই। ... অনেক সময়েই বৈজ্ঞানিক শব্দের তর্জমা পন্ডশ্রমমাত্র হয়ে দাঁড়াবে – রেলওয়ে, রেস্তোরাঁ, কিলোগ্রাম, সেন্টিমিটার, হুইল, লেদ, থার্মোমিটার, বয়লার, কাটার, ইলেকট্রন, অ্যাটম, ব্যাকটেরিয়া,

ফাঙ্গাস, ডিফারেনসিয়াল কোয়েফিসিয়েন্ট, ইন্টিগ্রেশান – এসব প্রায় সকলেই বোঝেন। পেপার, চেয়ার, টেবিল তো এখন প্রাত্যহিক ব্যবহার্য জিনিস। দৃষ্টান্ত বাড়ানোর দরকার নেই। আশা করি শিক্ষক-ছাত্ররা কোন বিষয় আলোচনার সময় এ ব্যাপারে অনায়াসেই একটা বোঝাপড়া করে নেবেন আর শিক্ষকের দায়িত্ব হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের কাজে ভাষা প্রয়োগের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হালের অবস্থান্তর সম্পর্কে নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখা" [১) ৯৬-৯৭] পরিভাষা প্রসঙ্গে তাঁর সাফ বক্তব্য ছিল – "জলে না নেমে সাঁতার শেখানোর দুরাশার মত, ভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার চেষ্টা না করে শুধু পরিভাষা সৃষ্টির চেষ্টা আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়েছে" [১) ২৭৭]।



টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আধুনিক জীবনে বিজ্ঞানের স্থান বিষয়ক আলোচনায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু একবার জাপানে গিয়েছিলেন, এবং সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। এমনিতেই

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত জাপান কিভাবে একটা আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়ালো এবং প্রযুক্তির অগ্রগতিতে সারা পৃথিবীকে বিস্মিত করে তুলল সে ব্যাপারে তাঁর কৌতূহল ছিল ভীষণ। জাপান থেকে দেশে ফেরার পর থেকেই বিভিন্ন ভাষণে ও লেখালেখিতে তিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছিলেন, এবং দেখিয়েছিলেন যে কিভাবে মাতৃভাষা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রসারে প্রতিবন্ধকতা তো হয়ইনা, বরং উল্টে এই কাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঐ আলোচনা সভায় জাপানী ছাড়াও দেশ বিদেশ থেকে আগত একাধিক গণিতবিদ, পদার্থবিদ, জীববিদ, দার্শনিক, এবং বিজ্ঞানীর সমাবেশ ঘটেছিল। কিন্তু সকলকেই বলা হয়েছিল যে ইংরেজী বা আরও কয়েকটা বিদেশী ভাষা বুঝতে পারলেও যেহেতু সারা দেশ জুড়ে শিক্ষা চলে জাপানী ভাষায় তাই আলোচনা সভায় সকলকে মূলত জাপানী ভাষা শোনার জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। অবশ্য অন্যদের বোঝার জন্য এবং উপস্থিত বিদেশী বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা জাপানী ভাষায় সেই দেশের মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য দোভাষীর ব্যবস্থা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ বসু অবাক হয়ে দেখেছিলেন যে – "আধুনিক রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে এক বিশেষ জটিল ও বিমূর্ত আলোচনা অনায়াসেই চালানো হল জাপানী ভাষায়" [১) ৮৫]। এছাড়া, তিনি সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও গেছিলেন। সেখানেও তিনি দেখেছিলেন যে পদার্থবিদ্যার আধুনিকতম দিকগুলোও পড়ানো হচ্ছে জাপানী ভাষায়। অনেক ধার করা শব্দ ব্যবহার করলেও সে বিষয়ে জাপানীদের

মধ্যে কোনও কুণ্ঠাবোধ তাঁর নজরে আসেনি। কলকাতায় বক্তৃতা দিতে আসা এক জাপানী বিজ্ঞানীর সাথে কথা বলেও তিনি একই কথা উপলব্ধি করেন। সেই বিজ্ঞানীর কথায় – "আমরা বিজ্ঞান বিদেশীর কাছে শিখেছি এবং হয়তো এতে সত্যকারের মৌলিক অবদান আমাদের খুব বেশী কিছু নেই – তবে যা আমরা শিখেছি, সবই জাপানীর উপযুক্ত রূপ দিয়ে তাকে আপনার করে নিয়েছি।" [১) ২৭৮] অথচ আমরা যদি ভারতের যে কোনও প্রাদেশিক ভাষার সাথে তুলনা করি তাহলে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে জাপানী ভাষা আয়ত্ত করা তুলনামূলক ভাবে কঠিন। জাপানী ভাষায় অক্ষরসংখ্যা কয়েক হাজার। ফলে, আমাদের দেশে মাতৃভাষা আয়ত্ত করতে যেখানে খুব বেশী হলেও বছর দুই সময় লাগে সেখানে জাপানী ভাষা শিখতে সময় লাগে প্রায় ছয় বছর। তা সত্ত্বেও এই ভাষা সেদেশে বিজ্ঞানচর্চার প্রধান মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং, বোঝাই যায় যে প্রশ্নটা হল সদিচ্ছার। সমস্যা হওয়া তো দূরের কথা, বরং, জাপানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা যখন চালু হয়েছিল তখন বিজ্ঞান, দর্শন, কলাবিদ্যা ইত্যাদি বিষয় পড়ানোর জন্য শিক্ষক খুঁজে পেতে একেবারেই অসুবিধা হয়নি। জাপানে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসু দেখেছিলেন যে সেখানে ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে স্কুলে যাওয়াটা বাধ্যতামূলক। কম করে নয় বৎসর তাদের শিক্ষালাভ স্কুলে গিয়ে শিক্ষালাভ করতে হয়। পড়াশোনার খরচ বহন করে সেখানকার মিউনিসিপালিটি কিংবা আমাদের দেশের মতই জেলা অথবা রাজ্যসরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ। এছাড়াও,

শিল্পকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এবং উপরের দিকের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও খরচার ভার বহন করে জাপান সরকার। স্বভাবতই তিনি এই ব্যবস্থা দেখে ভীষণভাবে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন এবং চেয়েছিলেন যাতে আমাদের দেশেও এমনটা বাস্তবায়িত হোক। যদিও আমাদের শাসকশ্রেণী কোনোদিনই সে পথে হাঁটেনি। বিনা খরচার শিক্ষাব্যবস্থা তো অনেক দূরের কথা, বরং বিপরীত পথে হাঁটতে হাঁটতে সাধারণ জনগণের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়ে আজ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ বেসরকারীকরণের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভারত আর জাপান এই দুই দেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান আলোচনার সমসাময়িক অবস্থার একটা তুলনা পাওয়া যায় তাঁর জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতার একটা ঘটনায়। তিনি লিখেছেন – “খবর পেলাম যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল সম্পর্কে দু-জন ভারতীয় বিজ্ঞানীর ইংরাজীতে লেখা একটি বইয়ের জাপানী তর্জমা হয়েছে। আমায় জানানো হল ঐ বইটি বেশ ভালোই বিক্রী হয়েছে ছয় মাসে, প্রায় তিন হাজারের মত। শুধু জাপানী ভাষাই পড়তে পারেন এমন সাধারণ জাপানীরা পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল জানবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং হয়ত তাঁরা এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ ভারতীয় মতামতকেই বেশী বিশ্বাস করেন অন্যদের চাইতে। তবু আমাদের দেশে ঐ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইংরাজীতেই লিখে চলেছেন ও তার ফলে তাঁদের দেশবাসীরা শতকরা ৮০ ভাগকেই অজ্ঞ রেখেছেন পারমাণবিক ভস্মপাতের বিপদ সম্পর্কে” [(১) ৮৫]। সুতরাং, বর্তমান ভারতে জাদুগুড়া বা

জাদুগুড়ার মত অন্যান্য তেজস্ক্রীয় ইউরেনিয়াম খনিতে আদিবাসীরা যে উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই খননের কাজ করে চলেছে, তেজস্ক্রীয় নিশ্বাস-জল-খাবার যে তাঁদের জীবনটাকে প্রতি মুহুর্তে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে – তাতে আর অবাক হওয়া কিসের। ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রীয়তা সম্পর্কে কিছু মানুষকে অজ্ঞ করে রেখে যদি তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে পোখরানের মত "জাতীয় গৌরব" অর্জন করা যায় তাহলে আর মন্দ কি। এই তো ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞানী এবং আমলাতন্ত্রের মনোভাব!



যেখানে বিজ্ঞানচেতনা দূরে থাক, সামান্য মানবিকতা বোধটুকুও নেই। এর বিরুদ্ধেই তো লড়াই ছিল সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মত বিজ্ঞানীদের। খুব কম জনেই তাঁর মত করে উপলব্ধি করে বলেছিলেন যে – "কেবলমাত্র বিদ্যা অর্জন ও জ্ঞানের অগ্রগতিতে সহায়তা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হতে

পারে না। জাতি, ধর্ম, মতবাদ, ধনী, দরিদ্র এবং সামাজিক ও বংশমর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ যে মূলত এক, এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষই যে পরম সত্য আমাদের সেই জ্ঞান হোক" [১) ৮৬]।

একথা সত্য যে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনের পিছনে ব্রিটিশ শাসকদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। তবে সেটা ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশদের নিজেদেরই স্বার্থে। ভারতের নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তিটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে একদিকে ব্রিটিশরা নিজের দেশে পুঁজিবাদী উৎপাদনের গতি বৃদ্ধি করার জন্য ভারত থেকে অবাধ কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিল, আর ব্রিটেনে তৈরী সামগ্রী বিক্রীর একটা বাজার তৈরী করেছিল এই দেশে। তার জন্য যেটুকু গঠনমূলক কাজকর্ম করার দরকার ছিল ঠিক সেটুকুই ব্রিটিশরা করেছিল। কিন্তু অনেকেই তলিয়ে সে কথা ভাবতে চান না। ফলে ইংরেজদের বিভিন্ন 'অবদান' সম্বন্ধে সেকালে অনেকের অন্ধ মোহ ছিল। এগুলোর মধ্যে একটা ছিল ইংরেজী ভাষার প্রতি মোহ, যার একটা বিরাট প্রভাব পড়েছিল এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায়। এমনকি স্বাধীনতার পরেও শিক্ষাব্যবস্থাকে এই ধরনের প্রভাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে নতুন শাসকশ্রেণী উদ্যোগী হয়নি। এই বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চিন্তাভাবনা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। এমনকি ইংরেজী শিক্ষা কিভাবে কেবল একটা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষা করে এসেছে সে কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর ভাষায় – "[আমরা] মনে করি বিদেশী ইংরাজ যে ভাবে শাসন

করে এসেছে – সেই বোধ হয় নিপুণতার শেষ কথা, তাই ইংরাজ চলে গেলেও ইংরাজী ভাষার মোহ আমাদের কাটে নি। ... অনেকের মনে ধারণা আছে যে, ভারতের ঐক্য – এটা আমরা ইংরাজীর কল্যাণে বুঝতে শিখেছি। কাজেই ইংরাজী শিক্ষা কায়েম করলেই হয়তো সেই ঐক্য জ্ঞান অটুট থাকবে। তাঁরা ভেবে নিয়েছেন, দেশের মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের স্তর বিভেদ থাকবেই এবং উপরের স্তরে ইংরাজী জানালা দিয়ে যে যে জ্ঞান ঐ জানালা সমীপবর্তীদের উদ্ভাসিত করে তুলবে, তারই কিছু বুদ্ধিমানের মত নিম্নভাগে পরিবেশন করে নিজেদের স্বার্থবৃত্তি অনুযায়ী রঙ্গিন করে নিয়ে বর্ত্তমানে যে ধরনের স্তর বিন্যাস সমাজে আছে তা চিরন্তনী করে রাখতে পারবেন" [১) ২৭৬]। অন্যত্রও বিভিন্ন স্থানে তাঁর বক্তব্যে এরূপ শ্রেণীচেতনার আভাস পাওয়া যায়, এবং তিনি স্পষ্টই এব্যাপারে তাঁর মত পোষণ করে বলেছিলেন যে – "এইভাবে দেশের উন্নতি করা কষ্টদায়ক। তাছাড়া সকলের দায়িত্ব অল্পসংখ্যক লোকের একটি শ্রেণীর উপর চিরকালের জন্য চাপানো উচিত নয়। দেশের লোকের উচিত নিজেদের বোঝা নিজেদের বওয়া। আমরা পনেরো বছরেও এ কাজে বিশেষ এগোতে পারিনি" [১) ১০৮-১০৯]। বর্তমানে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান প্রকল্প তথা স্বপ্নের 'হিন্দুরাষ্ট্র'-কে বাস্তবায়িত করার জন্য যাঁরা হিন্দি ভাষাটাকে সকল দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন তাঁদের পুরোধা মোদী আবার ২০১৮ সালের ১-লা জানুয়ারীতেই ঘোষণা করেছেন যে এই মহান বিজ্ঞানীর জন্মের ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে যেন বছর ব্যাপী বিভিন্ন

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিনি হয়তো জানেন না যে যাঁরা সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে নাম পরিবর্তনের রাজনীতি করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে এই মহান বিজ্ঞানী বলেছিলেন – "আমাদের দাবী হল শিক্ষিতদের উপর। তাঁরা চেষ্টা করুন দেশে নতুন যুগ যাতে আসে। শিক্ষার নতুন বাহন তাঁরা স্থির করুন। প্রদেশে প্রদেশে এমন ধরণের ব্যবস্থা চালু করুন যাতে তাড়াতাড়ি আমাদের দেশ থেকে অশিক্ষা অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়। এই সূত্রে ভাবোন্মাদীদের একটু সাবধান করে দিচ্ছি যে, শুধু একটা নাম খারিজ করে, একটা নাম কেটে দিয়ে, আর একটা নাম চালালেই আমাদের নতুন যুগের আহ্বান সার্থক হয়ে উঠবে না" [১) ১০৯]। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর এই সাবধানবাণী কোনও কালেই শাসকশ্রেণীর কর্ণগোচর হয়নি। আর বর্তমান শাসকশ্রেণী সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িক উস্কানি সমেত নাম পরিবর্তনের যে জঘন্য খেলায় মত্ত তাতে বোঝাই যায় যে অশিক্ষা অজ্ঞানতা দূর করার কোনও সদিচ্ছাই তাঁদের নেই, বরং এই অশিক্ষা অজ্ঞানতার উপর ভর করেই দেশজুড়ে তাঁরা তাঁদের নির্বাচনী রথযাত্রা সম্পন্ন করবেন বলে ঠিক করেছেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার বিষয়ে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদানের আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি আমরা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-এর কথা না বলি। ব্রিটিশ ভারতে ১৮৯৬ সালে বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশান ফর দি কালটিভেশান অফ সায়েন্স। কিন্তু তার ষাট বছর পরেও সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং তাঁর মত চেতনাসম্পন্ন

বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেছিলেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের শিকরকে আশানুরূপভাবে সাধারণ জনগণের ভিতর গেঁথে দেওয়া যায়নি, এবং এর একটা বড় কারণ হল বিদেশী ভাষা। দেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর কোনওরকম সরকারী উদ্যোগের আগেই ১৯৪৭ সালের ১৮-ই অক্টোবর কলকাতায় একটা মিটিঙে প্রস্তাব আনা হয় যে এমন একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে যার উদ্দেশ্য হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। এই মিটিঙে সভাপতিত্ব করেছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। মিটিঙে প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিক হয়েছিল – বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, এবং এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন ধার্য হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ২৫-এ জানুয়ারী। এই উপলক্ষ্যে একটা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল – "বর্তমান জগতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই আমাদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হচ্ছে, অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-দীক্ষা এমনভাবে চালিত হচ্ছে না যাতে আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্ভার জীবনের দৈনন্দিন কাজে সুচিন্তিতিভাবে ব্যবহার করতে পারি। এর প্রধান অন্তরায় ছিল বিদেশী ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা।" এই অন্তরায়কে অতিক্রম করার জন্য পরিষদের তরফ থেকে এই বিজ্ঞপ্তি-তে কিছু উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়েছিল যেখানে মাতৃভাষাকে বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যম হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল। যেমন – "স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবস্তু সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক যথাযথতা অক্ষুণ্ণ রেখে বিভিন্ন পরিবেশে সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক করে প্রকাশ করা", "বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক

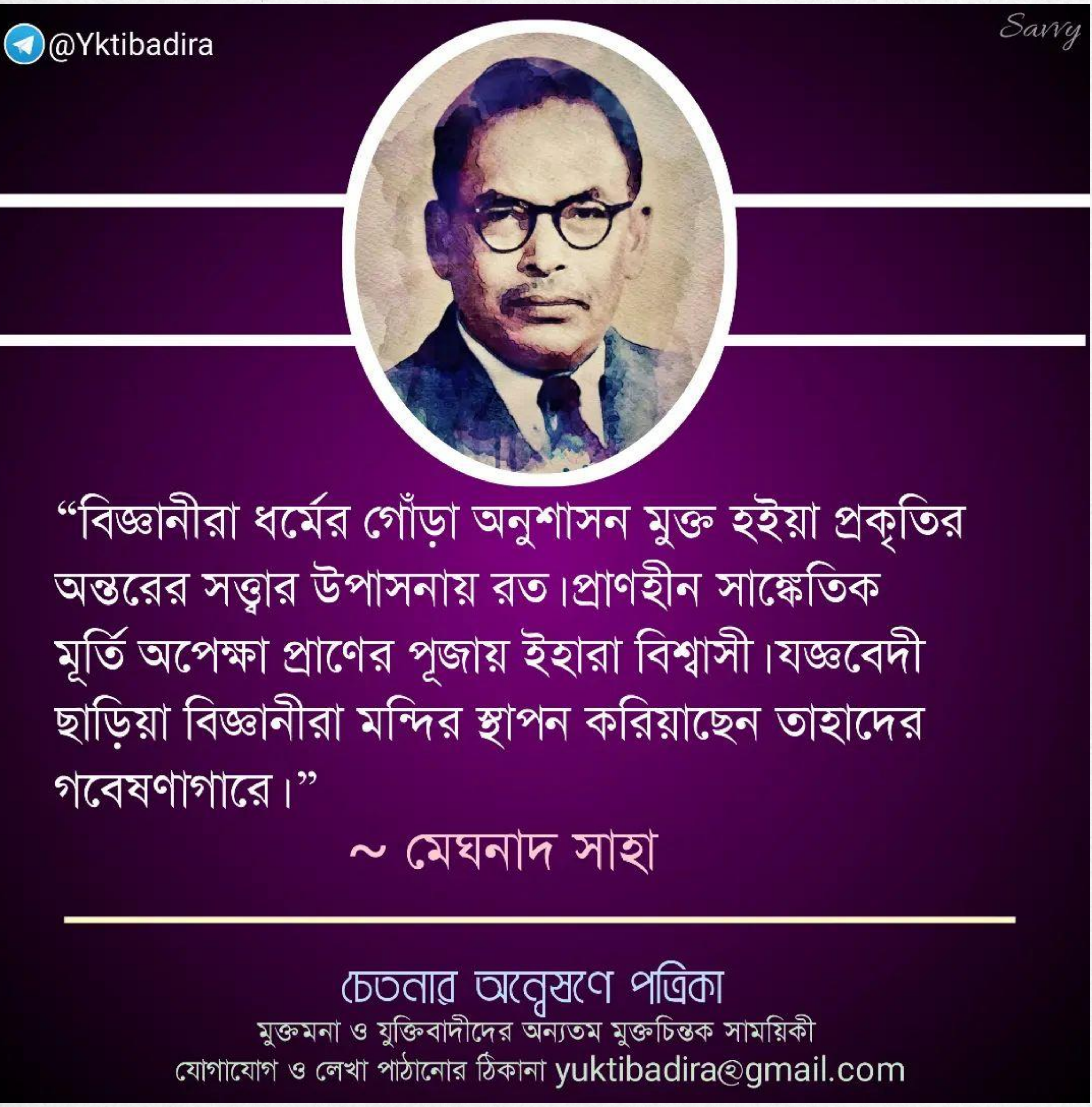
শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য ও তার পথের বাধা-বিপত্তি দূর করার জন্য বাৎসরিক সম্মেলন আহ্বান করা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা-মূলক অথচ জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর প্রদর্শনী ও তৎসংক্রান্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা করা" [২) ৯৯] ইত্যাদি। এই পরিষদের তরফ থেকে বাংলায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে একটা পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায় বাংলাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে সত্যেন্দ্রনাথ বসু-র এতটাই আগ্রহ ছিল যে হাইড্রোডায়নামিক্স-এর মত পদার্থবিজ্ঞানের কঠিন বিষয়গুলোও তিনি বাংলায় প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। বাংলায় তাঁর প্রথম বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়, ১৯৩১ সালে। এমনকি ক্লাসেও মাঝেমাঝে তিনি বাংলাতে বক্তৃতা দিতেন। একবার সাহা স্মৃতি বক্তৃতাতে কসমোলজিতে সর্বাধুনিক ধারণার কথা তিনি বাংলাতেই আলোচনা করেছিলেন। সুতরাং, শুধু তত্ত্বে নয়, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চাকে প্রয়োগের স্তরেও তিনি কার্যকরী করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর অধিকাংশ বক্তৃতাই হয় সংরক্ষণ করা হয়নি, বা হারিয়ে গেছে। কোনোদিন কোনও তৈরী বক্তৃতা থেকেও তিনি পড়েন নি, ফলে তার পাণ্ডুলিপি থাকারও কোনও সম্ভাবনা নেই। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যে সামান্য কিছু উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে তার থেকেই "মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা"-র বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা গুলোকে তুলে ধরার একটা চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। এই মহান ব্যক্তিত্বের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকীর

প্রাক্কালে, আসুন সকলে মিলে তাঁকে স্মরণ করি তাঁর চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে, এবং আলোচনা করি কিভাবে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চাকে তত্ত্বের গন্ডি পেরিয়ে প্রয়োগের বাস্তব ক্ষেত্রে নিয়ে এসে জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনার সঞ্চার ঘটানো যায়। তবেই স্বার্থক হবে তাঁকে স্মরণ করাটা।

তথ্যসূত্র –

১) সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সঙ্কলন – বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২) সত্যেন্দ্রনাথ বোস – শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়



সূচিপত্র

বইমেলা

লিখেছেন – অশোক দাস চার্বাক



বাবাগাধা - ছি ছি ছি!! তুই কিনা গাধার ব্যাটা হয়ে এ কথা বললি মুখ ফুটে? জিভে আটকাল না একটুও! ছি! কোনও গাধাকে কোনও যুগে কেউ বইমেলায় যেতে দেখেছে, না কোনও গাধাকে কেউ বই চিবোতে দেখেছে। গাধা জাতের নাম ডোবাবি দেখছি আহাম্মক গর্ধব কোথাকার। এর পরে

তো অল্পবয়সী তোর গাধা বন্ধুরা 'হাঁদাগাধারাম' বলে তোকে র‍্যাগিং করবে। হাঁট-হাঁট, নইলে এক্ষুনি মধু ধোপার চাবুক খাবি।

ছেলেগাধা - কেন বাবা, গাধারা বইমেলায় যায় না কেন?

বাবা- দরকারই হয় না। গাধারা হচ্ছে সবজান্তা। গাধাদের 'ব্যাদে' সব লেখা আছে। গাধাদের সে গর্ধববেদ পড়তেও হয় না কখনও। মেঘনাদ সাহা নিজে এ সার্টিফিকেট দিয়েছেন সব জন্মসিদ্ধ গাধাদের। গাধারা হচ্ছে ভূ-ভারতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রজাতির প্রাণী। বামুনদের মত ভগবান ব্রহ্মার মাথার ঘিলু থেকে তাদের জন্ম। পরশ্রীকাতর নিম্ন প্রজাতির মানুষরা লজ্জায় তা স্বীকার করে না বটে, তবে আমাদের প্রাচীন জন্মসিদ্ধ সাধুসন্ত মুনিঋষিরা এ কথা বলে গেছেন। আর আমাদের বাপ ঠাকুরদা চোদ্দোপুরুষেরা বংশ পরম্পরায় এ সনাতন কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে এসেছে। গাধাদের শাস্ত্রবাক্য, গাধামুনি ঋষিদের বেদবাক্য তো আর মিথ্যে হতে পারেনা। অনর্থক বই পড়ে নতুন জ্ঞান অর্জন করা যে কতটা নিরর্থক সেটা সব গাধারাই জানে।

ইচ্ছে হলে অন্য যে কোনও মেলায় যা। কোনও ভদ্রলোক গাধাও নিয়ে কিচ্ছু বলবে না। শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে চেপে পৌষমেলায় যা। সেখানে নরম নরম কচি কচি ঘাস দিয়ে তৈরী থালা, বাটি, ঠাকুরদেবতার পুতুল পশু প্রাণীদের আদলে তৈরী নানা আর্ট ওয়ার্ক চিবিয়ে চিবিয়ে খা। গরম গরম জিলিপি

খা। বুঝিস বা না বুঝিস, মাইকে রবীন্দ্র সংগীত শুনে হিন্দী গানে নাচতে নাচতে বড় মুখ করে বাড়ি ফের। নিজেকে বেশ ইন্টেলেকচুয়াল গাধা মনে হবে।

বন্ধুদের কাছে বড় মুখ করে বলতে পারবি রবীন্দ্রতীর্থ ভ্রমণের উপাখ্যান। সে পুণ্যে মরার আগেই তোর আত্মার শান্তি হয়ে



যাবে। মহাপাপীর ছেলেদের মত বিজ্ঞাপন দিয়ে আত্মার শান্তিকামনা করতে হবে না। বোকা শ্রাদ্ধশান্তিও করতে হবে না পুরুত ডেকে। শিল্পমেলায় যা-বাহারি দু’একটা ভোগবিলাসের জিনিস কিনে মনে আনন্দ পাবি। জিনিসগুলোর জন্য তোর গর্ব আর পড়শীর ঈর্ষা হবে। বড় সুখ হবে তোর মনে। খাদ্য মেলায়ও যেতে পারিস। সেখানে নানা দেশের ঘাস বিচালি খেয়ে আস্তাবলে শুয়ে শুয়ে জাবর কাট মনের সুখে। অপার আনন্দ পাবি মনে। ঋণ মেলায় ব্যাংকের টাকা ধার করে শোধ না দেবার মতলব কর। দাদা দিদি নেতা মন্ত্রীদের

কাটমানি দিয়ে হাতে রাখতে পারলে কেউ তোর টিকি ছুঁতে পারবে না। টাকা চুরির অনাবিল আনন্দ পাবি মনে। বিবাহ মেলায়ও যেতে আপত্তি নেই। মনের মত একটা ইউজ এন্ড থ্রো বউ ধরে নিয়ে আয় ওখান থেকে। সারাজীবন না হোক বছরখানেক until the day of divorce বেশ ফুর্তি করতে পারবি। সাগর মেলায়ও যেতে পারিস। সেখানকার নোনতা জলে গোলা দৈব ডিটারজেন্টে বছরভর করা সব পাপ কেচে কুচে সাফসুতরো করিয়ে আয়। আহা, মুখ শুকনো করছিস কেন? পাপের ফল, মানে ঐ কালো টাকা-ফাকাতো আর সাগরজলে ধুয়ে যাবে না। শুধু পাপটুকু। ওগুলো গা থেকে মুছে আবার নবোদ্যমে বিধবা লতাপিসির বাগানের শাকসবজি খেয়ে পাপ করা শুরু করে চালিয়ে যা পরের পুণ্যস্নান পর্যন্ত। সাধুসাজা চতুর মানুষেরাও এসব পুণ্যকর্ম করে। কেউ এ জন্য গালমন্দ করে না। দু'একজন বোকা গাধা ছাড়া সব বুদ্ধিমান কৃতী গাধারাই সে সব পাপ করে পেট মোটা করে।

যে কোনও মেলা থেকে ফেরার পথে মনে একটা অনাবিল আনন্দ পাবি। কিন্তু বইমেলা! দূর দূর দূর! দু-চারখানা সস্তা বই, কিছু লিটল ম্যাগ আর ব্যাগভর্তি ক্যাটালগ নিয়ে যখন মেলার গেট পেরিয়ে বাইরে আসবি, তখন তোর মন একেবারে শুকনো মরুভূমি হয়ে যাবে। আত্মা পাথর। তখন শুধু মনে হবে মেলায় কত্তো বই আর ট্যাঙ্কের টাকা কত কম। মোট বওয়ার ফাঁকে মেলায় গেলা বইগুলো জাবর কাটার সময় মনে হবে - হায় আমি কত কম জানি। অন্য মেলায় গিয়ে পেটভরে,

মনও ভরে। আর এ মেলায় পাবি শুধু দুঃখের সমুদ্র। এখানকার ক্ষুধা সর্বগ্রাসী। বইয়ের খিদে কখনো মেটে না। যত কিনবি তত কিনতে ইচ্ছে করবে। কেঁদে কেটে কুল পাবি না একেবারে।



গুরুজনেরা বলেন বড় সাংঘাতিক দ্রব্য ঐ বই। সর্বদুঃখের কারণ। পশুপ্রাণীদের মানুষই সবচেয়ে দুঃখী। কেন জানিস? বই, মানে যাকে বলে গিয়ানের খনি। সেই জ্ঞানবৃক্ষে ঝুলে থাকা নিষিদ্ধ ফলগুলো যেদিন হতভাগা মহাপাপী মানুষেরা বোকার মত খাওয়া শুরু করল সেদিন থেকেই শুরু হল ওদের দুঃখের ইতিহাস। যে যত বই পড়েছে, যে যত জ্ঞানী হয়েছে সে তত অজ্ঞান অশিক্ষিত বলে নিজেকে ভাবতে শিখেছে।

এটাকে ডাক্তারী ভাষায় বলে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স। সক্রেটিস থেকে শুরু করে নিউটন সব লেখাপড়া জানা মানুষেরা নিজেদের অজ্ঞান ভেবে সারা জীবন দুঃখকষ্টে কালাতিপাত করেছে। সারা জীবন আরও আরও জ্ঞান চেয়ে হ্যাংলার মত কাঙাল হয়েছে।

বইমেলায় গেলে তোকেও ওই মারণ রোগে ধরবে। কথায় বলে, বইয়ের নেশা সর্বনাশা। ড্রাগের মত। একবার ধরেছ তো ভবিষ্যত অন্ধকার। ফতুর করে ছেড়ে দেবে ক্যান্সার রোগীর গরীব ছেলেমেয়েদের মত।

তবে হ্যাঁ, ধর্মীয় বইয়ের কথা আলাদা। সেগুলো গাধারা দুলে দুলে চিবিয়ে চিবিয়ে বেশ খায়। কিচ্ছু অর্থ বুঝতে হবে না, শুধু গলায় ঢুকিয়ে মুখস্ত করে বইগুলো গিললেই হবে। জাবরও কাটতে হবে না হজম করার জন্য। অথচ তোর মনে একটা সবজান্তা আধ্যাত্মিক ভাব জন্মাবে। গাধাদের মধ্যে যারা গুরুবাবা হয় তারা আবার ওই সব বইয়ের গালগপ্পের কোর্টেশন সহ ভক্তদেরকে বাণী শুনিয়ে খুব খাতির পায়। মোট বয়ে চাল কলা ঘাস বিচালি আয় করতে হয় না তাদের। যে সব গাধাদের একটু কম বুদ্ধি তাদেরকে স্বর্গের লোভ আর নরকের ভয় দেখিয়ে তাদের মুখ থেকে কচি ঘাস কেড়ে খায় মহানন্দে। আর হদ্দগাধা ঐ বোকা গাধারা নিজেরা অভুক্ত থেকে চতুর গুরুবাবা পুরুতবাবাদের পেট মোটা করিয়ে পুণ্যি অর্জন করে। যা, রাস্তার ওপারে গাছের তলায় বসে থাকা তেল সিঁদুর মাখা পাথরটায় তোর সামনের পায়ের ক্ষুর ঠুকে প্রণাম করে আয়। পরকালের জন্য পুণ্যি হবে। আজকে বেশি ঘাস দেবে মধু, মরার পর স্বর্গে যাবি।

হ্যাঁ, যে কথাটা বলছিলাম। এই যে বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ। এ দেশে এমন হাড়-হাভাতে দৈন্যদশা কেন জানিস? কবিতা,

গল্প, আড্ডা, আর ঐ বইপড়ার নেশা। ঐ নেশাটাই বাঙালি জাতটাকে একেবারে দেউলিয়া করে ছেড়ে দিয়েছে। কর্মবিমুখ। এখানকার লোকেরা বোঝে না যে, যে সময় অনর্থক বই পড়বি সে সময় একটু বেশি করে মোট বইলে মধু ধোপা একটু বেশি ঘাস বিচালী ওভারটাইম দেবে। দেবে কিনা? সেই অমূল্য সময় হেলায় অপব্যয় করে তোরা যদি কবিতা উপন্যাস আর বস্তাপচা যুক্তিবাদী দর্শন পড়িস কেউ তোকে খেতে দেবে? দেবে না। এই ওয়ার্ক কালচারটা তোরা যদি না বুঝিস গাধাদের জিজ্ঞেস করলেই তো পারিস। অথবা আমাদের জীবনযাপনের বৈজ্ঞানিক কৌশল শিক্ষা নকল করতে পারিস। কেন না আমাদের জীবনই আমাদের বাণী।

উন্নতি নাই তাই ঐ বই নেষুড়ে মানুষদের। যারা বই লেখে তারা আরও হতভাগা। যেমন ধর মাইকেল। মেঘনাদ না লিখে যদি বাপের জমিদারিটা দেখতিস, তাহলে পায়ের ওপর পা তুলে কত সুখে কত বেশিদিন বাঁচতিস। তা না করে কাব্য লিখতে গেলি। তাও আবার উল্টোপাল্টা রামচন্দ্র বিরোধী কাব্য। কি লাভ হলো তাতে? ধারদেনা করে অকালে অক্কা পেলি, বৌ পালালো, ছেলে মরল। শেষ বয়সে 'কি ফল লভিনু হায়' বলে মাথা চাপড়ালি। আবার দেখ না, রুশদি নাসরিনদের। কী দরকার ছিল হাবিজাবি লেখবার? খাওয়া পরার তো অভাব ছিল না তোদের। বাড়িতে কোরান, বাইবেল, গীতা, ব্রতকথা, পুরাণেরও অভাব ছিল না দুলে দুলে পাঠ করবার জন্য। বাপেদের পয়সাও ছিল, আবার নিজেদেরও

এলেম ছিল পয়সা রোজগারের। ঐ হাবিজাবি বই লেখার জন্যই তো আজ তোরা ঘরছাড়া, দেশছাড়া হয়ে ধার্মিকদের ছুরি, গুলি খাবার ভয়ে পথে পথে ছুটে বেড়াচ্ছিস। এবার বুঝলি ব্যাটা কেন বইমেলায় যাবি না। বইয়ের নেশা মারাত্মক। নতুন বইয়ের গন্ধেও নেশা ধরায়। তাই বুদ্ধিমান গাধারা কখনো বই পড়ে না, বইমেলার ধার দিয়েও যায় না।

মানুষগুলো কী বোকাবুদ্ধু দেখ। গর্ধবের এক শেষ। হাজার হাজার বছর ধরে ভেবে, কোটি কোটি বই লিখে, দেশ বিদেশের সভা সমিতিতে সেমিনার করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস লিখে এখনও তারা ঠিক করতে পারল না তারা কী খাবে, কী পরবে, কী ভাবে শোবে, কী ভাবনা ভাববে, আমাদের মত ফুল উলঙ্গ থাকবে, না নটনটীদের মত হাফ উলঙ্গ থাকবে, কী ভাষায় কথা বলবে, কোন সুরে গান গাইবে। শুধু রাশি রাশি বই লিখেই চলেছে। সুস্বাদু নরম কচি কচি ঘাসবিচালী পচিয়ে কাগজ বানাচ্ছে, আর সেই কাগজে হাবিজাবি ছাপছে। কিন্তু এত করে ঐ রামগর্ধব মানুষের দল কোনও কিছুর কুল কিনারা করতে পেরেছে? পারেনি। মনে শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন। তার উত্তর পেল তো সেটা আবার আর একটা প্রশ্ন হয়ে গেল। সেই নবজাত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আবার হয়রান। এর শেষ নেই। অনন্তকাল ধরে এই ট্র্যাডিশন চলছে মানুষদের মনে।

কিন্তু প্রকৃতির সেরা সৃষ্টি গাধাদের দেখ। সেই কোন যুগে গাধাদের মুনি ঋষি সাধু সন্তেরা কত সহজে সব কিছু তাঁদের গর্ধব পুরাণ, গর্ধব শাস্ত্রে, গর্ধব উপনিষদে ঠিক করে দিয়ে গিয়েছেন। সেগুলোর নির্দেশ একেবারে ধ্রুব সত্য। ধ্রুব নক্ষত্রের মত স্থির, নিশ্চল। পরিবর্তন সংশোধন কিচ্ছু করতে হয় না গবেষণা করে। ঠিক কি ভুল বিচার করতে হয় না। লাখো লাখো বছর আগে একটা গাধা যা ভেবেছে, যা খেয়েছে, সারা পৃথিবীজুড়ে যে ভাষায় কথা বলেছে, যে সুরে গান গেয়েছে, আজও সারা পৃথিবীর তাবৎ গাধারা সেই একইভাবে চলছি, একই সনাতন ধর্ম বিশ্বাসের সাথে পালন করে চলেছি। ভাষা, চিন্তা, ধর্মের বা জীবনযাপনের কোনও ভেদাভেদ মতভেদ নাই গাধাদের মধ্যে। সনাতন ধর্মের কোনও পরিবর্তন, কোনও সংশোধন এমেন্ডমেন্ট কিচ্ছু করতে হয়নি। সারা বিশ্বের সমস্ত দেশের সমস্ত গাধার সনাতন চিন্তারও কোনও ভেদাভেদ নেই। বাঙালিগাধা-ইংরেজগাধা, হিন্দুগাধা-মুসলমান গাধা বলে কোনও কৃত্রিম ভেদাভেদ নেই। গাধাদের সেই সুপ্রাচীন বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহ্য মহান। আমরা মনে করি "বাসুধৈব কুটুম্বকম", সারা দুনিয়ার সমস্ত গাধারা পরস্পর আত্মীয়, পরস্পর ভাই। আমরা 'ওরা' 'আমরা' ভেদ করি না। বলি না"। তাই আমরা গর্বের সাথে বলি "আমরা গাধা "

আস্তে চলার জন্য এই যে চাবুকটা খেলি পিঠে, তার জন্য তোর মনে কি কোনও কষ্ট হলো? পিঠটা দু'মিনিটের জন্য সামান্য জ্বলে গেলেও মনে কোনও কষ্ট হয়নি। বুদ্ধিমান

গাধাদের মনে কোনও কষ্ট হয় না। কেন জানিস? কেন না আমরা জানি দুনিয়ার নিয়ম অনুযায়ী এটা আমাদের প্রাকৃতিক পাওনা। আমাদের পূর্ণগর্ধব ধর্মগুরু একশোআট শ্রী মহাগাধানন্দ বলেছেন এটা আমাদের বিগত জন্মের পাপের ফল। প্রেমময় ঈশ্বরের অপার করুনা। এতে দুঃখ বেদনার কি আছে। একটু পরে ঘাটে পৌঁছে গেলেই তো কাপড়ের গাঁটরি নাবিয়ে নিয়ে আমাদের ছেড়ে দেবে ঘাস খেতে। আমরা তখন স্বাধীন।

কিন্তু মানুষকে দেখ। ওরা বইতে পড়েছে যে ফ্রান্স রাশিয়া চীনে দক্ষিণ আফ্রিকায় নাকি বিপ্লব হয়েছে। লন্ডনে মানবাধিকার আন্দোলন হচ্ছে। তুই যদি মূর্খ মানুষদের ঐসব বই পড়িস তোরও তখন চাবুক খাওয়ার জন্য দুঃখ হবে, রাগ হবে। মন প্রতিবাদ করতে চাইবে। গর্ধবাধিকার কমিশন বসানোর দাবিতে ইনকিলাব করতে ইচ্ছে করবে। অশান্তির একশেষ হবে। তুই তখন মরবি।

তাই বলি, বইমেলার ধরে কাছে যাবি না। মানুষদের বোকা বোকা রোগ ওসব। মরুক ব্যাটারা বইমেলার ধুলাবালি খেয়ে। আমরা গলায় দড়িঘন্টি বেঁধে টুং টাং করতে করতে দুর্লভ গর্ধব জীবন উপভোগ করি। মালিকের দেওয়া ঘাসবিচালী খাই আর গলা তুলে দু'পা উঁচু করে গাধা প্রজাতির জীবনমুখী গান গাই। চল, হাঁট।

সমালোচনা: সম্পাদক অথবা

asokdas.godless@gmail.com/ asokdas1943@gmail.com

সূচিপত্র

অলৌকিক নয়, লৌকিক

লি খে ছে ন – ম হ ম্ম দ ম হ সী ন



আমাদের চারিপার্শ্বের সব ঘটনাই লৌকিক, বাস্তবিক। অলৌকিক বলে কিছু হয় না, সবই লৌকিক। যৌক্তিক মননশীলতাতেই এটির স্বরূপ আমাদের মাঝে স্থাপিত হতে পারে।

আজ পর্যন্ত একজনকেও পেলাম না, যিনি নিজেকে ভাবেন ধর্মান্ধ।

প্রত্যেকে মনে করেন, অন্যে ধর্মান্ধ, অন্যে যুক্তিবাদের কিছু বোঝেন না, অন্যে স্বার্থপর। তিনি কিন্তু যুক্তির পরাকাষ্ঠা। যুক্তিবাদের ধারক বাহক। তিনি সংস্কারহীন, ধর্মান্ধতামুক্ত, সৎপথের অনুসরণকারী।

তিনি যে যুক্তিবাদী, তার প্রমাণ তিনি কুসংস্কার মানেন না। কুসংস্কার কাকে বলে? ঐ যে পরীক্ষার দিনে ডিম খেতে নেই। এর তিনি যুক্তিসম্মত কারণ আবিষ্কার করেছেন।

আবার আরেক ধরণের যুক্তিবাদী আছেন, তারা ডিম খেয়েও দেখেন, যে তাতে না কি পরীক্ষায় ভাল ফল করেছেন। যুক্তিবাদী এসব বালখিল্য পরীক্ষা করতে যাবেন?

একজন ভাবলেন যে সাপে কাটলে ওঝার মন্ত্র তন্ত্রে কোনো কাজ হয় না। সাপে কাটা রোগী তার হাতে মারা পড়ল। কাজেই ওঝার কাছে যাওয়াটা কুসংস্কার।

ভাল কথা, এবার চিন্তা করুন।

কাউকে সাপে কাটলো, তাকে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, কোনো কারণে, হতে পারে বিষহীন কামড় বা কামড়েও বিষ না ঢালা প্রভৃতি কারণে, বেঁচেও গেল। তাহলে কি ওঝাগিরি সায়েন্টিফিক হয়ে গেল? যুক্তিবাদে স্বীকৃতি পেয়ে গেল? সেইরকম, ডিমভক্ষণেও পরীক্ষালব্ধ ফল ভাল হলে ডিমভক্ষণও তো সায়েন্টিফিক হয়ে গেল, তাই না? এই যুক্তিতে ডিম খেয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়ে ফেল করলে, ডিম না

খেয়ে যাওয়ার প্র্যাক্টিসও তো তাহলে বিজ্ঞানসম্মত হয়ে যায়, তাই না?

আসলে যুক্তিবাদের কতকগুলি উপাত্ত আছে। যেগুলির একদিক বিচার করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সত্যে উপনীত হতে গেলে তার বিপরীত প্রান্তেও দৃষ্টিনিক্ষেপিত করার প্রয়োজন হয়। বলা ভাল, তার চারিদিক দেখতে হয়।

র‍্যাশান্যালিজম যেমন মানুষপ্রাণীর ধর্ম, এ্যান্টির‍্যাশান্যালিজমও তেমনি মানুষপ্রাণীর মধ্যেই দেখা যায়। এজন্যই মানুষের মাঝে ধর্মপ্রাণদের অনেকে যুক্তিবাদী বলে মনে করেন। ভূতে অবিশ্বাসীদের যেমন যুক্তিবাদী ভাবা হয়, ভগবানে বিশ্বাসীদেরও তেমনই যুক্তিবাদী বলে স্বচ্ছন্দে মেনে নেওয়া হয়। অন্ধবিশ্বাসের মুখোশ হলো এ্যান্টির‍্যাশান্যালিজম যা অনেক সময়েই যুক্তিবাদের ছদ্মবেশে ঘোরাঘুরি করে।

যুগ যুগ ধরে ধর্মগুরুদের মিথ্যাচার সমাজে অসত্যকে সত্যের প্রতিষ্ঠা দেয়।

একটা উদাহরণ দিলে, বিষয়টি আরও স্পষ্ট হতে পারে। যেভাবেই হোক, একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেলেই, তার সমস্ত কাজের ভিত্তিতে যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করার লোকের অভাব হয় না। এমনকি তার কাজের সমর্থনের পিছনে অলৌকিক কিছু ঘটনার অবতারণা করা হলেও শিক্ষিত সমাজে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরিবর্তে সমাদৃত হতে দেখা যায়, অথচ এই পৃথিবীর নিয়ম হলো অলৌকিক কিছু হয় না। এ জগতে অলৌকিকতার কোনো স্থান নেই। সমস্তই লৌকিক। একজন ধর্মগুরু প্রৌঢ়

বয়সে বিয়ে করতে চান একটি বালিকাকে। এজন্য তিনি জানান এটি স্বয়ং ঈশ্বরের নির্দেশ। সমস্ত লোক তাকে সমর্থন করলেও, তিনি নিজে তো জানেন, কতবড় মিথ্যার আশ্রয় তিনি নিয়েছেন। তার অনুসরনকারীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাঁকে দেখে অথচ তিনি নিজে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলে, মানুষের সেই বিশ্বাসকে পুঁজি করে এইরকম মিথ্যাচার করতে পারতেন না। গুরু নিরীশ্বরবাদী হলেও শিষ্যরা কিন্তু ঈশ্বরে পুরোমাত্রায় বিশ্বাসী।

আসলে নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মাধ্যমে এই বিশ্বাসের যাপন ঘটে চলে অষ্টপ্রহর। এর শিকড় আষ্টেপৃষ্ঠে জমাট বাঁধে ব্যক্তিমনে, জীবনে, জীবনশৈলীতে। তার থেকে বেরোনোর কথা তার মননে আসতেই পারে না। তখন তার এই মেকি মূল্যায়ণের সমর্থন খোঁজে তার ধর্মাদর্শে, তার ধর্মগ্রন্থে, ঠিক যেখানে শুরু তার ধর্ম প্রণেতার মিথ্যাচার, বৃত্ত যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, বর্তমান উপস্থিত হয় ঠিক সেই বিন্দুতেই। এজন্য সমস্ত ধর্মের গ্রন্থেই মিথ্যাচার, অজ্ঞানতা, অনিষ্ঠা, অনীতিগুলি নির্মিত হলেও ধরা পড়ে না ভক্তের ভক্তিভিত্তিতে বেড়ে ওঠা জীবনাদর্শে। কী শিক্ষিত, কী অশিক্ষিত, এই যুক্তি-অন্ধত্ব সকলের মধ্যেই প্রকট। এই অন্ধকার ভেদ করে আলো আসতে দেরী আছে। অনেক দেরী আছে।

কাজেই এই সময়কে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনতে হলে, আমাদের জোর দিতে হবে মানুষের মন থেকে অলৌকিকতাবাদকে দূর করার কাজে। অলৌকিক যেখানেই খবর পাওয়া যাবে সেখানেই ছুটতে হবে।

সম্প্রতি আমি খবর পেলাম হুগলী জেলার প্রান্তে জিরাট কবুরা গ্রামে একটি ঝিল আছে, যেখানে না কি সন্ধ্যার পর পাম্পসেট চালানো যায় না। এমনকি দিনের বেলা চালিয়ে দিলেও সন্ধ্যা নামতে না নামতেই পাম্পসেটটি বন্ধ হয়ে যায় আপনা আপনিই। তো আমি আর কী করতে পারি, তাকে বললাম, আপনি নিজে দেখেছেন? উনি জানালেন, না উনি দেখেননি। এমনকি প্রত্যক্ষদ্রষ্টা কারুর নামও জানাতে পারলেন না। শেষে উনি নিজেই উপলব্ধি করলেন, এতদিন ঠিকমত খবর না নিয়ে উড়ো কথায় বিশ্বাস করে ভ্রান্ত ধারণায় ছিলেন। পাম্পসেট বন্ধ কেন হবে তার যুক্তিসঙ্গত কারণ আন্দাজ করতে পারলেন না। অলৌকিক উপায়ে হয়তো হতে পারে বলেই তার ধারণা। এবার অনুরোধ করলাম, তাহলে যারা দাবী করেন তাদের কাউকে আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে বলুন। শত প্রচেষ্টাতেও একজনকেও পাওয়া গেল না, যিনি এই চ্যালেঞ্জ নিতে চান। অর্থাৎ এতদিন শোনা কথা শুনেই এসব অলৌকিকে বিশ্বাস করছিলেন তারা, কিন্তু চ্যালেঞ্জ নেওয়ার কথা উঠতেই কেউ রাজী হলেন না, কারণ তারা আসলে কেউই দেখেননি, শুধুমাত্র শুনেই বিশ্বাস করেছেন, যাচাই করে দেখেননি। বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষা কথা উঠতেই স্বীকারই করে নিলেন, অমন আবার হয় না কি? হয়তো কোনো কারণে কারুর পাম্পসেট কোনো একবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার ভয়, তার অন্ধবিশ্বাস থেকেই গুজব রটেছিল, না যাচাই করেই এতদিন তারাও সেকথাই বলে চলছিলেন, আজ বুঝলেন এমন

ঘটনার দাবী করাটা ঠিক নয়। এর কোনো বাস্তব ভিত্তিই নেই।

আমাদের যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রসারের কার্যধারায় তাই অলৌকিকতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলাটাই প্রাথমিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যেখানেই অলৌকিক কিছুর কথা জানা যাবে, বুঝিয়ে দিতে হবে এগুলো গুজবমাত্র, সত্য ভিত্তি নেই। চ্যালেঞ্জ নিতে বললেই তাদের উপলব্ধিতে আত্মীকৃত হবে যে আসলে অলৌকিক বলে কিছু হয় না। অলৌকিক ছিল না, অলৌকিক থাকবেও না। ধর্মগুরুদের অলৌকিক কাজগুলি আসলে কৌশলের আশ্রয়ে বাস্তব কোনো উপায়েই সম্পাদন করা। অর্থাৎ প্রতিটি অলৌকিক কাজের পিছনেই আছে লৌকিক প্রকৌশল, বাস্তব কারণ, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তার স্বরূপ অনুধাবন করাটাই একমাত্র সঠিক পথ।

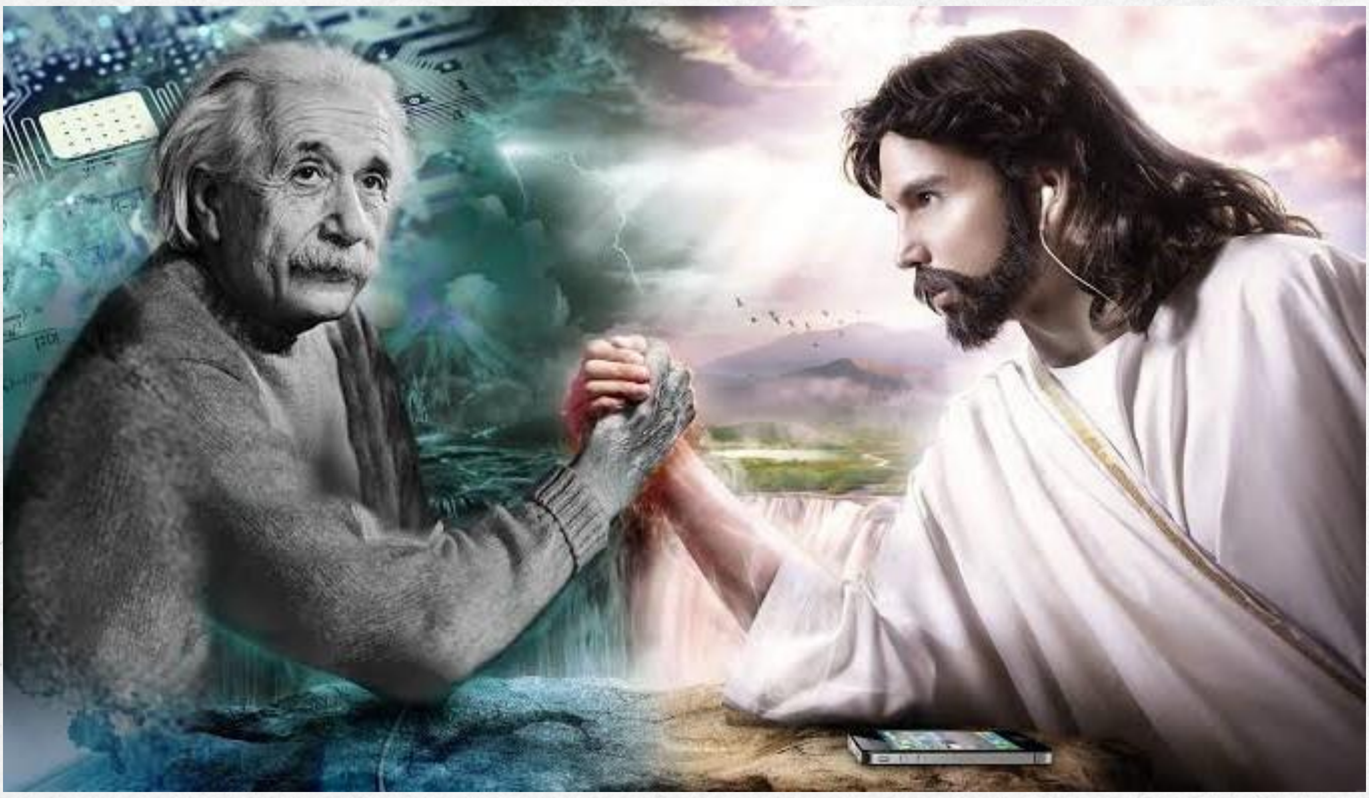
যুক্তিবাদী আন্দোলনে তাই অলৌকিকতাবাদকে মানুষের মন থেকে মুছে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা, ঘটনাগুলি যেখানে যেখানে করে দেখানো সম্ভব, সেখানে সেখানে লৌকিক উপায়টি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াই পথ।

যুক্তিবাদের তাই নীতি: অলৌকিক নয়, লৌকিক।

সূচিপত্র

ধর্ম ও বিজ্ঞান দ্বন্ধ

লি খে ছে ন - জা হি দ রু দ্র



বিশ্বের কোনও ধর্মীয় নেতা বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত করেন না কারণ বিজ্ঞান প্রকৃতির চিরন্তন সত্য এবং যা ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মীয় ব্যবসাকে ধ্বংস করবে। ধর্ম মানুষ চাইলেই পরিবর্তন করতে পারে বা চাইলে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করতে পারে এবং নতুন নাম দিয়ে নতুন ঈশ্বর তৈরি করতে পারে। কেউ তার ধর্মে দীক্ষিত হোক বা না হোক সেটা অন্য বিষয়। আপনার পরিবার যদি তা পালন করতে থাকে, তবুও হাজার বছর পর সেই ধর্ম পালনকারীর সংখ্যা হাজারের মধ্যে হতে পারে। ধর্ম এবং ঈশ্বর (ঈশ্বর) যেমন বিভিন্ন মানুষের জন্য আলাদা হতে পারে, তেমনি বিজ্ঞান শুধু

পৃথিবীতে নয়, মহাবিশ্বের সর্বত্র একই, কারণ বিজ্ঞান চিরন্তন সত্য।

বিজ্ঞানের নিয়মসমূহ (Laws of Nature) ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আগে থেকেই ছিল। আসলে, প্রকৃতির নিয়মই হল বিজ্ঞান। প্রকৃতির নিয়ম অর্থাৎ আমাদের মহাবিশ্ব ১৩৭০ বিলিয়ন বছর আগে বিগ ব্যাং-এ গঠিত হয়েছিল বিজ্ঞানের নিয়মে। বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ, চুম্বকত্ব, মাধ্যকর্ষণিক বল ইত্যাদি হতে আরও অন্যান্য বহু নিয়ম (Laws of Nature) -এর ফলে কঠিন, তরল এবং বায়বীয় পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এগুলো সবই প্রাকৃতিক ঘটনা। প্রকৃতির উপরোক্ত নিয়মের সাহায্যে, মানুষ আজ আরামে বসবাসের জন্য বিভিন্ন মেশিন, যানবাহন এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর তৈরি করতে সক্ষম। প্রকৃতি যদি ইচ্ছামত উপরোক্ত আইন পরিবর্তন করতে পারত, তাহলে আমরা অনেক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হই, অর্থাৎ প্রকৃতি নিজেই উপরোক্ত আইন পরিবর্তন করতে পারবে না। যদি প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়ম পরিবর্তন করতে পারে, তাহলে কোনও এক সময়ে আমাদের মহাবিশ্বের যে কোনও গ্রহে জ্বালানিচালিত যানবাহন যেখানে থাকবে সেখানেই থাকবে, যদি তারা গরম হয়ে গেলে পদার্থের আয়তন না বাড়ায়। একইভাবে বিদ্যুতের নিয়ম পরিবর্তন করা হলে মহাবিশ্বের যে কোনও স্থানে থাকা বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলো অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর থেকে প্রকৃতির নিয়ম এভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এমন কোনও প্রমাণ নেই।

পদার্থের ভর অনুযায়ী মাধ্যকর্ষণিক বল থাকে। পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির আগে থেকেই এগুলো আমাদের মহাবিশ্বে ছিল, আজও আছে এবং মানুষ হারিয়ে গেলেও ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই বিজ্ঞান চিরন্তন সত্য। কিন্তু ধর্মগুলো মানবসৃষ্ট। এই ধর্মগুলোর সত্যতার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। খ্রিস্টান সম্প্রদায় কোপার্নিকাস, ব্রুনো এবং গ্যালিলিওর বিবৃতিতে "পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র হিসাবে" সম্পর্কে বাইবেলের ভুল বর্ণনাকে সংশোধন করে যে পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়।

ধর্মের অসত্যটা যুক্তি দিয়ে তুলে ধরলেই কেউ ধর্ম বিদ্বেষী হয়ে যায় না। ঈশ্বর একটি কাল্পনিক শব্দ, ঈশ্বর নামে কিছু থাকলে এতদিনে প্রমাণিত হতে কি বাকি থাকত? না নিশ্চয় বাকি থাকত না। এককথায় স্ক্রিজোফোনিয়াতে আক্রান্ত মানুষরাই দৈববাণী শুনতে পারে আর তাদের কল্যাণেই পৃথিবীতে গড়ে উঠে ঈশ্বর ও ধর্ম।

ধর্ম বিশ্বাসী আবেগী ধার্মিকগণ সচরাচর মানবিক আচরণের সকল সংজ্ঞার সমীকরণ ধর্মের বাণী দিয়ে ব্যাখ্যা করে ছক্কা মেরে বসেন, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও একটি বারের জন্যে চিন্তা করে দেখেন না যে পৃথিবীতে হাজার হাজার ধর্মের জন্ম হয়েছে আবার তা সময়ের গহ্বরে হারিয়েও গেছে। যে ধর্মগুলো আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় এখনও ধুঁকে ধুঁকে টিকে আছে, যেখানে সকল ধরনের মধ্যযুগীয় আচার, নিয়ম-কানুন দিয়ে সেই সব ধর্মগ্রন্থগুলো পরিপূর্ণ, হাস্যকর বিষয়

হচ্ছে আবেগী ধার্মিকগণ সেই সব অমানবিক আচার, নিয়ম-কানুনগুলোকে বৈজ্ঞানিক আবরণ লাগাতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ, সৌরজগতের সূর্যকেন্দ্রিক মডেল, এবং বিগ ব্যাং। এইসব বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, যুক্তি প্রমাণ ও ব্যাখ্যা ধর্ম দ্বারা প্রতিরোধ করা চেষ্টা করা হয়েছে ও হচ্ছে। বিজ্ঞান এবং নাস্তিকতার উত্থানকে রেনেসাঁ নামে দ্রুত সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের সময়কে দায়ী করা যেতে পারে যা প্রায় পাঁচশত বছর আগে ইউরোপে শুরু হয়েছিল। এই রেনেসাঁ পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধগুলিকে বিশ্বে আধিপত্যের দিকে পরিচালিত করে। উদার, বুদ্ধিজীবী এবং নাস্তিক মনোভাবগুলিকে দিন দিন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। অনেক ধর্মীয় নেতা এই মূল্যবোধগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কেউ কেউ বিজ্ঞানের সাথে বৃহত্তর চুক্তির জন্য ধর্মগ্রন্থের পুনর্ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন বা এই ব্যাখ্যাগুলোকে নিজেদের মনের মাধুরী দিয়ে সাজাবার চেষ্টা করেছেন।

বিজ্ঞানের প্রমাণ ও যুক্তি বিশ্ব ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের অসামঞ্জস্যের দিক তুলে ধরেছিল, ফলে যেখানে যারা পরিবর্তন করতে অনিচ্ছুক তারা নিজেদেরকে সংস্কারকদের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। ফলস্বরূপ, পুরানো ধর্মগুলি নতুন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে, প্রত্যেকেরই ঐতিহ্যগত

বিশ্বাসের নিজস্ব ব্যাখ্যা দিতে থাকে। উদাহরণসরূপ বলা যায় যে অনেক আবেগী ধার্মিকগণ ধর্মগ্রন্থের মাঝে বিগ ব্যাং খোঁজার চেষ্টা করছেন, চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করার লেখা হয়েছে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে জোয়ার-ভাঁটার যে ব্যাপক পরিবর্তন হওয়ার কথা ছিল সে বিষয়ে কেনই বা বিন্দুমাত্র কিছুই লেখা হলো না? এভাবে গোঁজামিল দিয়ে লেখার কারণটাই বা কি? বা আরও বলা যায়, যদি মহাবিশ্ব একটি বিস্ফোরণ দিয়ে শুরু হয় তবে কেউ দাবি করতেই পারেন যে ঈশ্বর বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন, যদিও ধর্মগ্রন্থে এসব কোথাও লেখা নেই। যদি ডাইনোসরের জীবাশ্ম পাওয়া যায় তাহলে ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য সেগুলো সেখানে রেখেছেন বলে অনেকেই দাবি করতেই পারেন তবে ধর্মগ্রন্থে এসব কোথাও লেখা নেই বা থাকে না, কারণ যিনি ধর্মগ্রন্থগুলোকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এনেছেন তিনি হয়তো গ্রন্থের কিছু পাতা ভুল করে ঈশ্বরের টেবিলে ফেলে এসেছেন। এসব প্রশ্ন মনের মাঝে উদয় হলে কি নরকের আগুনে পুড়তে হবে? যদি পৃথিবী কোটি কোটি বছর পুরানো হয়, তাহলে জেনেসিসের গল্পে একটি দিন শত কোটি বছরের সমান। এগুলি বাইবেলের প্রকৃত ব্যাখ্যা যা বিজ্ঞান দ্বারা জোরপূর্বক অস্তিত্বের জন্য বাধ্য করা হয়েছে। সক্রেটিস যেমন অনুমান করেছিলেন, এটি অনুসন্ধানী মনের শূন্যতা যা আমাদের সত্যের দিকে চালিত করে। এবং এমনকি যদি একটি ধর্ম নিরঙ্কুশ সত্যের উপর আঘাত করে, তবে এই সত্যটি জানে এমন গোঁড়া ধারণা সর্বদা একই দাবি করা অন্যান্য ধর্মের

সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করবে। এই কারণেই ধর্ম সংঘর্ষের জন্ম দেয় এবং যে কোনও ধরনের বিশ্বাসের ক্ষতি হয়।

।২।

প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বর কি গণিতের উত্তর পরিবর্তন করতে পারেন? না, পারেন না। প্রকৃতির সব চিরন্তন সত্য গণিতের নিয়ম অনুসারেই ঘটছে। আমরা তাপ এবং আলো পাই কারণ হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি সূর্যের কেন্দ্রে উচ্চ মাধ্যাকর্ষণ চাপের অধীনে হিলিয়াম পরমাণুতে ফিউজ করে, শক্তিশালী ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ তৈরি করে যা পুরো সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে। তারা হল চলমান বিদ্যুতের ভাণ্ডার। আমাদের সূর্য-আকারের নক্ষত্রগুলির একটি আলোক-দানকারী জীবনকাল সাধারণত ১ বিলিয়ন বছর থাকে, যার অর্থ হল যে যতক্ষণ পারমাণবিক ফিউশন চলতে থাকে ততক্ষণ আলো এবং তাপ বিকিরণ চলতে থাকে। মহাকর্ষ বল (Mass) বস্তুর ভর দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভর যত বেশি, মহাকর্ষ বল তত বেশি। পদার্থ নিজেই গ্রাভিটন (Graviton) নামক একটি কণা নির্গত করে যা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তৈরি করে। কোন ঈশ্বর ১ কেজি ভরের বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ২ কেজি ভরের বস্তুর চেয়ে বেশি করতে পারেন না। এটাই গণিতের সত্য। বৃহস্পতি গ্রহ পৃথিবীর তুলনায় ১১ গুণ প্রশস্ত এবং তিনশো গুণ বেশি বড় এবং এর মাধ্যাকর্ষণ ১০ গুণ বেশি। সমান উচ্চতা থেকে পতিত একটা নুড়ি ১ কেজি বলে (ত্বরণ ৯.৮১কেজি.মিটার / সেকেন্ড বর্গ) পৃথিবীতে আঘাত করলে তা ১০ কেজি (ত্বরণ

১০×৯.৮১ কেজি. মিটার/সেকেন্ড বর্গ) শক্তি নিয়ে বৃহস্পতি গ্রহে আঘাত করবে। সবচেয়ে বড় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ব্ল্যাকহোলে ঘটে, যা পাশ দিয়ে যাওয়া আলোকে আকর্ষণ ও শোষণ করতে পারে।

আমাদের তারকামণ্ডল কেন্দ্রে একটি বিশাল Supermassive Black hole রয়েছে 4 মিলিয়ন সূর্যের ভর যাকে বিজ্ঞানীরা Sagittarius A নাম দিয়েছেন। সৌরজগৎ সহ তারকামণ্ডল সমস্ত পদার্থ এটিকে ঘিরে ঘোরে। এই ঘটনাগুলিও গণিত দ্বারা নির্ধারিত হয়। মহাকর্ষের কারণে গ্যালাক্সির মধ্যে সংঘর্ষও হয়। যখন তারার কেন্দ্রে হাইড্রোজেন ফিউজ হয়, হিলিয়াম পরমাণুগুলি কার্বন পরমাণুতে ফিউজ হয় এবং তারপরে কার্বন পরমাণুগুলি লোহার পরমাণুতে ফিউজ হয়। এইভাবে, একটি নক্ষত্রের কেন্দ্রে ভারী পরমাণু জমা হওয়ার ফলে একটি শক্তিশালী মহাকর্ষীয় বল তৈরি হয় যা সূর্যের চেয়ে ৮/৯ গুণ বড় একটি নক্ষত্রকে একবারে বিস্ফোরিত করতে পারে এবং তীব্র ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ এবং খুব শক্তিশালী Gamma ray, X- ray সহ পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে এবং Nebulae মেঘ তৈরি হয়। এই বিস্ফোরণকে Supernova বলা হয়।

Nebulae মেঘগুলিও ছোট তারা গঠন করতে পারে। এইভাবে তারার Supernova র জন্য গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণু এবং উল্কা ইত্যাদি উৎপত্তি হয়। সেইজন্য গ্রহ, উপগ্রহ,

ধুমকেতু, Asteroid, উল্কা আদি উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ আমরা সকলই মৃত তারার অংশ। তাই আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের সকল শক্তিই মাধ্যকর্ষণ বল এবং পরমাণুতে থাকা বিদ্যুৎ চুম্বকত্বের থেকে বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া কোনও ঈশ্বর, আল্লাহ বা গডের সৃষ্টি করা নয়। শক্তি রূপান্তরের এই প্রক্রিয়া কোনও কাল্পনিক ঈশ্বর, আল্লাহ, এমনকি গড এটি পরিবর্তন করতে পারে না। সবকিছুই গণিতীয় (Mathematical) সম্বন্ধমতে চলে। আমাদের পৃথিবীতে সৃষ্টি হওয়া বাতাস, ঝড়, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ, সাগরীয় স্রোতের মাধ্যকর্ষণ বল, তাপের প্রভাবে হয়। এগুলো প্রত্যেকটা একে অপরের সঙ্গে গাণিতিক মেলবন্ধনে যুক্ত। এই গণিত কোনও কাল্পনিক ঈশ্বর আল্লাহ বা গড এটা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

।৩।

অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থ মতে, জীবের আত্মা থাকে বুকে। কিন্তু বিজ্ঞান মতে একটা জীব চালিত হয় মগজ দ্বারা। প্রথায় সকল জীবের দেহে কম বেশি বিদ্যুৎ থাকে। এর মধ্যে সবথেকে বেশি থাকে ইলেক্ট্রিক ফিসের (Electric Fish)। একটি পূর্ণবয়স্ক বৈদ্যুতিক ইল মাত্র ২ মিলি সেকেন্ড ৬০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে, যা আমাদের বাসা বাড়িতে সংযুক্ত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় প্রাপ্ত ভোল্টের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। জানা যায় ৬০০ থেকে ৮৬০ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুত উৎপাদন করতে ৬ ফুট লম্বা ইল ৬০০০ পেশী কোষকে ব্যবহার করে।

আমাদের মগজ এবং কলিজার পাম্পটা বৈদ্যুতিক পালস (Pulse) র সহায়ত কাজ করে। জীবের মগজ Electric circuit একটা কম্পিউটার থেকেও বহু গুণ জটিল। মগজ দেহের বিভিন্ন অংশে নির্দেশনা বৈদ্যুতিক পালসের দ্বারাই দিয়ে থাকে। তাই একটা জীব চালিত হয় তার মগজ দ্বারাই। আমাদের কলিজার পাম্পের কার্যক্ষমতা যদি হ্রাস পায়, চিকিৎসক বেটারিযুক্ত Space maker লাগিয়ে দেন। সেই জন্য আত্মা বলে যে বস্তু সেটা বুকের মধ্যে থাকে না। জীবের আত্মা যদি বলতেই হয় তবে মগজকে ধরে নিতে হবে। ডলফিন মাছ আমাদের চিকিৎসা বিভাগে ব্যবহৃত Ultra sonography থেকে শক্তিশালী Sonography waves ব্যবহার করে গর্তের ভেতর লুকিয়ে থাকা শিকার খুঁজে ধরে খেয়ে থাকে।

বিজ্ঞানে কোনও সর্বজ্ঞ নেই। অর্থাৎ বিজ্ঞানে কোনও গুরু, মাসিমা বা নবী রসূল নেই। কোনও একজন যদি সূত্র আবিষ্কার করে যাওয়া জ্ঞান নিয়ে আরও একধাপ অগ্রসর হোন, এইভাবে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন বিষয়ে আবিষ্কার করা ব্রহ্মাণ্ডের চিরসত্য কথাগুলো রিসার্চ করে করে বিজ্ঞান চর্চা আজকের এই অবস্থায় আসতে পেরেছে। বিজ্ঞানে কোনও হিন্দু বিজ্ঞান, মুসলমান বিজ্ঞান বলে শ্রেণীবিভাজন থাকে না কারণ ইহা চিরসত্য কথা। একটা গণিতের শুদ্ধ উত্তর এটাই

আসবে কিন্তু সেই গণিতের অশুদ্ধ উত্তর যে কোনও অর্থাৎ লাখো হাজার সংখ্যা দেওয়া যাবে।

ধর্ম এবং বিজ্ঞানের এখানেই পার্থক্য। প্রত্যেক ধর্মে নিজের ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করেন সকল ধর্মগুরুরা। ধর্মগুরুকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন কেন এভাবে হবে, তখনই গুরু রেগে অগ্নিশর্মা। কারণ ধর্মে গুরুর বাণীই হল চিরন্তন সত্য কথা। কিন্তু বিজ্ঞানে সব কিছু নিজে পরীক্ষা করে সত্য নিরূপণ হওয়া কথাগুলোই গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রীধারী একজন লোক অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারার হতে পারে অন্যদিকে যে ব্যক্তি কোনওদিন স্কুলে যায় না সেও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার একজন ব্যক্তি হতে পারে। উল্লেখ্য যে মানুষ ছাড়া মহাবিশ্বের প্রায় সব প্রাণীই বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা নিয়ে বাস করে তারা তাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে যে কোনও পরিবেশ বা বস্তু অধ্যয়ন করে এবং পদক্ষেপ নেয়।

সমাজ সংস্কারক কাজ করতে হলে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই নিজের মত প্রকাশ করতে হবে, কেউ মানুক বা না মানুক। আমার মত মূলত নারীর সমানাধিকারের পক্ষে, মানবতার পক্ষে, যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞানমনস্কতার পক্ষে। পৃথিবীকে আমাদের সন্ত্রাসমুক্ত এবং বাসযোগ্য করা ছাড়া উপায় নেই। সবার মতপ্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করা এবং সবার জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছাড়া উপায় নেই। জীবনের শেষ শ্বাসটুকু পর্যন্ত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে অন্ধকারে ডুবে

মরতে দেখা কি আর সহ্য করা যায়! পৃথিবীতে যত সরকার আছে, সবারই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ত্যাগ করতে হবে। বিজ্ঞানমনস্কতা হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ধর্মান্ধতা মানুষকে বাঁচায় না, বাঁচায় বিজ্ঞান, বাঁচায় যুক্তিবুদ্ধি।

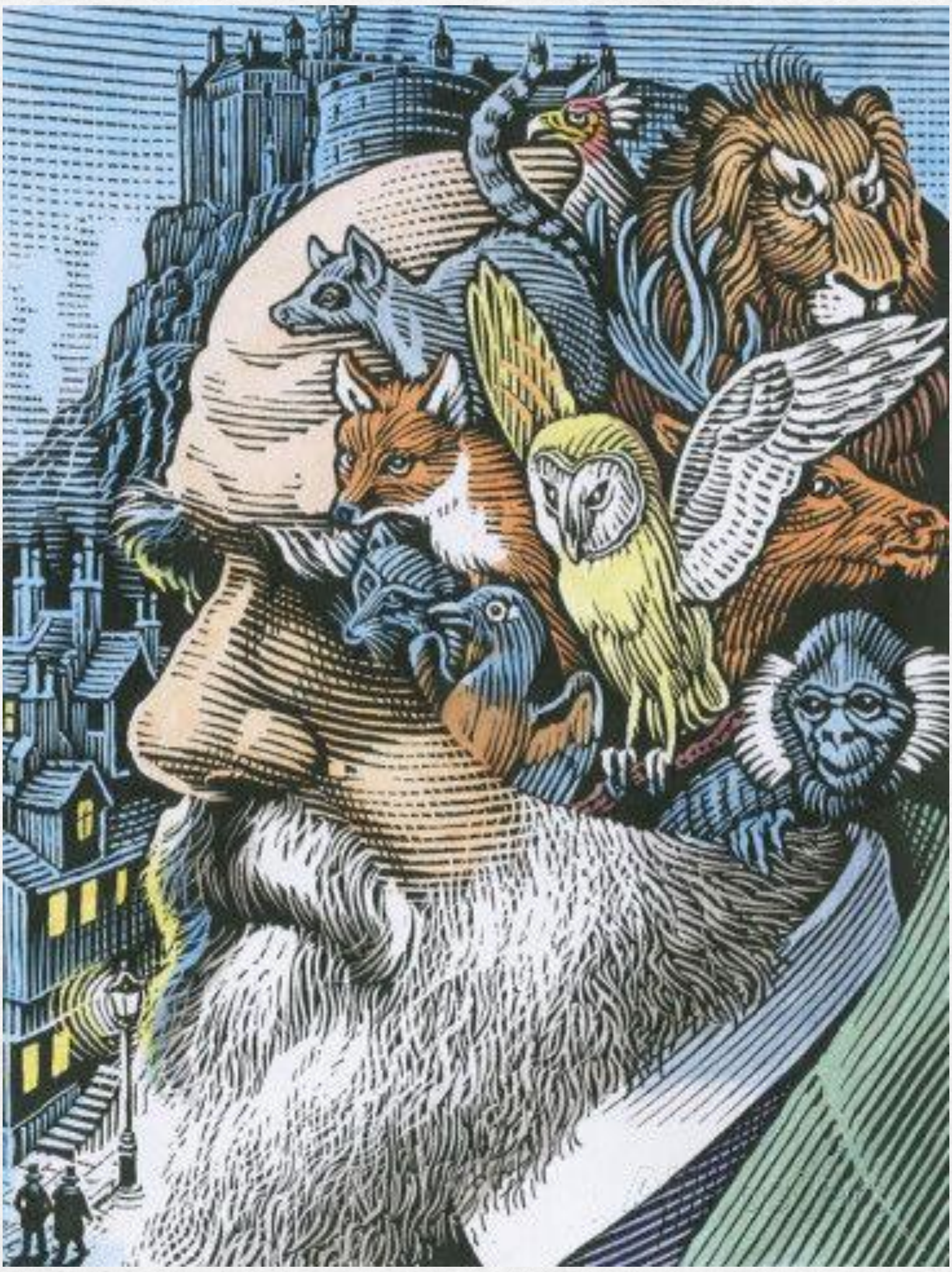
"আমি যা করতে পারি তাই করব এবং আমার যা বলা উচিত তাই বলব। এই অসহিষ্ণু কণ্ঠ আমাদের নীরবতার মধ্যে শক্তি খুঁজে পায়। তাদের হুমকির পরিবর্তে শব্দ ব্যবহার করে তর্ক করতে শিখতে দিন।"

- গৌরী লঙ্কেশ

সূচিপত্র

সংগঠিত ধর্ম কোনোদিন ডারউইনকে পছন্দ করেনি

লিখেছেন – শম্ভুনাথ চার্বাক



প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল সত্তার নূতন আবির্ভাবে – কে তুমি, মেলেনি উত্তর দিবসের শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে,

নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় –কে তুমি, পেল না উত্তর।

(শেষ লেখা -রবীন্দ্রনাথ)

জীব সৃষ্টি হয়েছে কিভাবে? জীবকে সৃষ্টি করেছে কে? এই প্রশ্ন মানুষের মনে নিরন্তর ঝড় তুলেছে সভ্যতার বিকাশের শুরুর সময় থেকেই বড় বড় বিশ্বমানবরাও দ্বিধাগ্রস্ত এই ব্যাপারে। ছোটবেলা থেকেই উঠতে বসতে ঘরে বাইরে শুনে আসছি সব তার সৃষ্টি। প্রশ্ন এসেছে মনে, জিজ্ঞাসা করলেই বলতো ডেঁপো ছেলে। প্রমাণের কি আছে হাজার-হাজার বছর ধরে মানুষ এবং তোমার পূর্ব পুরুষেরা বিশ্বাস করে আসছে, তোমাকেও তাই বিশ্বাস করতে হবে বিনা প্রশ্নেই। এসব বলেই দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে, বেশী বললেই মার জুটতো কপালে। ধর্মের বিবর্তনের এবং ঈশ্বর-গড-আল্লাহদেরও বিবর্তন ঘটেছে এই পৃথিবীতে। ব্যাবিলন সুমের মিশর আরব নরওয়ে রোম গ্রীসের পেগান বা মূর্তিপূজকদের দেবদেবীদের ইহুদী খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা বিলুপ্ত করে দিয়েছে পৃথিবী থেকে। একমাত্র ভারতে উদ্ভুত পেগান বা মূর্তীপূজক ধর্মগুলি টিকে আছে। তাও আজও সারা পৃথিবীতে প্রায় ৪২০০ ধর্ম টিকে আছে। এই প্রচলিত বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম হিন্দু খ্রিস্টান ইসলাম ইহুদী সবাই বলে তাদের নিজেদের ঈশ্বর-গড-আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরদের কোন সার্বজনিনতা নেই। সব ধর্মের প্রধান পুরুষ, কোন মহিলা নেই। এদের ঈশ্বর – গড – আল্লাহ প্রত্যেকেই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রত্যেকটি ধর্ম অপর ধর্মের ওপর আঘাত হেনেই বিকাশ লাভ করেছে এবং বারবার ধর্মের কারণে পৃথিবীকে রক্তাক্ত করেছে। ভারতে হিন্দু বনাম বৌদ্ধ বা জৈনের লড়াই, শৈব

শাক্ত বৈষ্ণবের লড়াই বাংলা দেখেছে মধ্যযুগে এবং হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টানের লড়াইও দেখেছে, দেশভাগ দেখেছে ধর্মের কারণে, উদ্বাস্তু হওয়া দেখেছে ধর্মের কারণে। রক্তাক্ত ক্রুসেড দেখেছে এশিয়ার ভূখন্ড ।

চার্লস ডারউইন ইংল্যান্ডের অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন। নিজেও প্রচণ্ড ধর্মভীরু ছিলেন এবং ভবিষ্যতে ধর্মযাজক হওয়ার স্বপ্নও দেখতেন । কারণ ইংল্যান্ডে সেই সময় ধর্মজাজক হওয়া যথেষ্ট সম্মানের । কিন্তু জীব বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করার সময় জীব ও জীব সৃষ্টির জিজ্ঞাসা ডারউইনের কিশোর মনে ঝড় তুলেছিল প্রচন্ডভাবে। সেই ঝড়েই ডারউইনের জাহাজ বিগল গ্যালাপাগাস দ্বীপে অবতরণ করলো ১৮৩৫ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারী। আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী ডারউইনের জন্মদ্দিন। ডারউইনের চিন্তা ভাবনাকে যেন উসকে দিতেই এইদিন চিলির উপকূলে নোঙর করা অবস্থায় তাঁদের জাহাজ এইচ এম এস বিগল কেঁপে উঠলো প্রবল এক-ভূমিকম্পে! দুই মিনিটের সেই ভূমিকম্প শেষে ডারউইন এবং জাহাজের ক্যাপ্টেন মহাবিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করলেন উপকূলের ভূমির উচ্চতা বেড়ে গেছে প্রায় আট ফুট! তাহলে কি লায়েলের Principle of Geology’র কথাই ঠিক? সব পরিবর্তনই কি প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা করা শক্তিগুলোর ফলাফল?

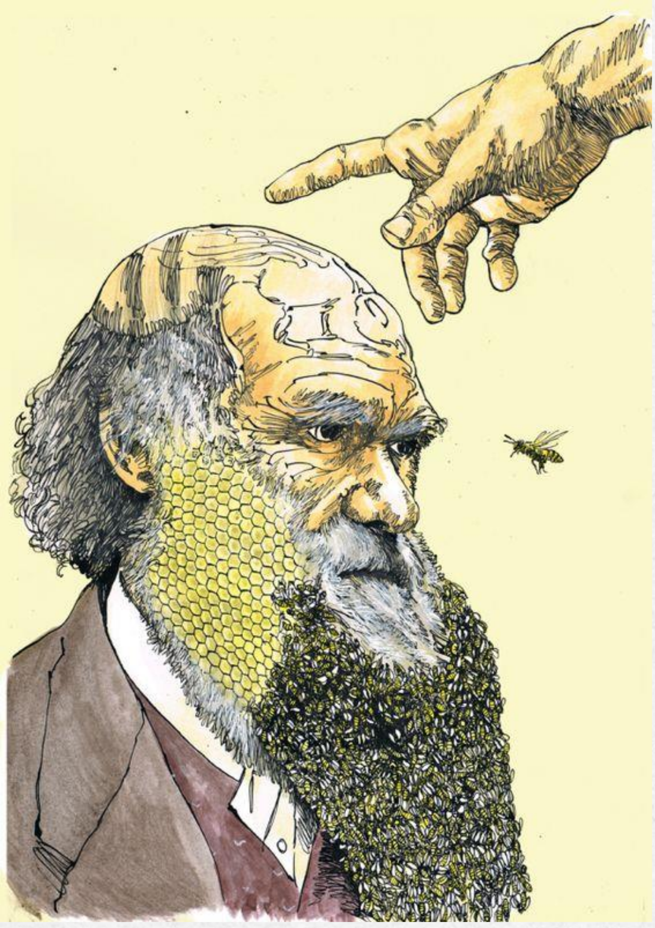
১৮৩১ সালে জাহাজে ওঠার আগে ডারউইনকে তাঁর শিক্ষক এবং একইসাথে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর হেনেস্লো অপর এক প্রখ্যাত ভূতাত্ত্বিক চার্লস লায়েলের লেখা Principle of

Geology বইটি উপহার দেন। গভীরভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হেনেস্লো কড়াভাবে ডারউইনকে বলে দেন যেন ভুলেও লায়েলের লেখাগুলোকে বিশ্বাস না করেন! কিন্তু ডারউইন জাহাজে যেতে যেতে প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা দেখতে দেখতে গুরুর উপদেশ ভুলে গভীর সন্দেহে নিজেকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন একের পর এক। কি ছিল লায়েলের সেই বইয়ে! লায়েল তাঁর বইয়ে বলেছিলেন, "নূহের আমলের এক কথিত মহাপ্লাবন দিয়ে পৃথিবীর ভূ-ভাগ রূপান্তরিত হয়নি। ভূভাগ বিবর্তনের অন্যতম কারণ হল বাতাস, বৃষ্টি, ভূমিকম্পের মতন অসংখ্য ছোটবড় প্রাকৃতিক শক্তি। এগুলোই অতীত থেকে বর্তমান সময়ে ভূভাগের পরিবর্তন ঘটিয়ে এসেছে এবং আসছে।" গুরুর কথা ভুলে ডারউইন তাই মনোনিবেশ করলেন আশেপাশের ভূপ্রকৃতির উপর এবং আস্তে আস্তে দীক্ষিত হয়ে উঠলেন লায়েলের সেই যুক্তিপূর্ণ রূপান্তরের মতবাদে। আর তার চাক্ষুষ প্রমাণ আজ পেলেন।

এই ভূমিকম্প নিয়ে ভাবতে ভাবতেই যাত্রাপথে আবার জাহাজে করে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লেন ভার্দে দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৫ ফুট উঁচু একটি দ্বীপে। সেখানে দেখা গেল পাহাড়ের গায়ে এক রহস্যময় সাদা দাগ চলে গেছে মাইলের পর মাইল। পরীক্ষা করে জানা গেল রহস্যের তেমন কিছুই নেই, শামুক ঝিনুকের খোলের চুনাপাথরের ক্ষয়ই এই লম্বা দাগের রহস্য। কিন্তু শামুক ঝিনুক এতো উঁচুতে এক পাহাড়ের গায়ে এলো কিভাবে? তাহলে কি একসময় সেই পাহাড় লুকিয়ে ছিল সমুদ্রের জলের নিচে?

আর সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারটি দেখা গেল গ্যালাপ্যাগাস দ্বীপপুঞ্জে নামার পর। এই দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপ দেখতে দেখতে তরুণ ডারউইন দেখতে পেলেন বিভিন্ন প্রজাতির একগাদা ফিঞ্চ পাখি, যেগুলোকে আমরা ফিঙে নামে ডাকি। ডারউইন অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন সবগুলোই ফিঞ্চ পাখি হলেও অবাক করা জিনিস হলো এদের খাবারের প্রকৃতি অনুযায়ী বদলে গেছে এদের গঠন। যেমন যেগুলো গাছে থাকে তারা খায় একরকম খাবার, যেগুলো মাটিতে থাকে তারা খায় আরেকরকমের খাবার। খাবারের ধরন অনুযায়ী সেই পাখিগুলোর আকৃতিও বিশেষ করে চঞ্চু আলাদা! তিনি এই বৈচিত্র্য দেখতে দেখতেই এদের ১৩টি প্রজাতির বর্ণনা দেন, দেখান প্রজাতির বৈচিত্র্য। এই ১৩টির পর বর্তমানে আর একটিসহ মোট ১৪টি প্রজাতির ফিঞ্চ আমরা প্রকৃতিতে দেখতে পাই। এই পাখিদের দেখার পরেই তিনি প্রাথমিকভাবে সম্মত হলেন যে, বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই জীবের মাঝে একেকরকম বৈশিষ্টের পরিবর্তন ঘটে এবং তারা ক্রমেই অভিযোজিত হয়ে তৈরি করে এক বা একাধিক নতুন প্রজাতি! সুতরাং প্রজাতি হল এমন কিছু জীবের সমষ্টি যারা শুধু নিজেদের মধ্যে প্রজননে সক্ষম। যেমন- আধুনিক মানুষ Homo sapiens sapiens প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। অন্য কোন প্রজাতির সঙ্গে তারা কেউ প্রজনন করতে পারবে না!

ডারউইন আদতে এই তথ্যটি প্রকাশ করতে যথেষ্ট দ্বিধা করেছেন। কেননা তিনি নিজেও বুঝেছিলেন তাঁর দেওয়া মতবাদ কতটা বৈপ্লবিক। আরেক বিজ্ঞানী হুকারের কাছে লেখা চিঠিতে তাই তিনি লিখেছিলেন - নিজেকে তাঁর বড় একজন অপরাধী মনে হচ্ছে, তিনি যেন একজন নরঘাতক হিসেবে স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন! তাই তত্ত্বের সত্যতা জেনেও কেবলমাত্র সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত হতে তিনি আরও ২০ বছর ধরে গবেষণা করে লিখলেন জীববিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত বই- The origin and Species by means of Natural Selection!!



ডারউইনের তত্ত্ব যে ভুল নয় তার প্রমান আমরা দেখতে পাই অন্যপ্রাণীদের মতন মানুষেরও অসংখ্য প্রজাতি আবিষ্কৃত হওয়ায়। এগুলোর মধ্যে হোমিনিড গণের অন্তর্ভুক্ত হোমো স্যাপিয়েন্স, হোমো ইরেক্টাস-সহ অসংখ্য প্রজাতির ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে মানুষের মতন আরও অন্য এক প্রজাতি নিয়ান্ডারথালদের ফসিল। অনেক গবেষণার পর

দেখা গেছে একপ্রজাতির বনমানুষ বা এপদের সঙ্গে মিলে গেছে আমাদের ডিএনের প্রায় ৯৮.৬%! ডারউইনের সময় কার্বন ডেটিং-সহ অনেক পরীক্ষার সুব্যবস্থা না থাকলেও এটা এখন পরীক্ষিত গবেষণাধর্মী সত্য যে, ৪০-৮০ লক্ষ বছর আগে একধরণের জাতি দুইপায়ে ভর করে দাঁড়াতে শিখলেও তাদের থেকে বর্তমান আমাদের অর্থাৎ আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটেছে মাত্র দেড় থেকে দুইলক্ষ বছর আগে। এপর্যন্ত একটি ফসিলও পাওয়া যায়নি যেটি ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদকে সমর্থন করেনা। এমনকি মজার কথা হল ডারউইন পূর্ববর্তী সময়েও জর্জ বুফো, হাওয়ার, ওয়ালেস, উইঙ্গারসহ বেশকিছু বিজ্ঞানী ছিলেন যারা বুঝতে পেরেছিলেন প্রজাতি স্থির নয়, চলমান বিবর্তনের ফসল। কিন্তু এরা বিবর্তনকে মেনে নিলেও সেটি কিভাবে ঘটে তা কেউই ডারউইনের আগে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। বিখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের বহুল পঠিত Ancestor’s Tale বা আশির দশকে ড. টিএম বেড়ার লেখা Evolution and Myth of Creationism কোনোটিই ডারউইনের বিবর্তনবাদ অতিক্রম করেনি, বরং সমর্থন যুগিয়েছে বহুগুনে। ডকিন্স তাঁর প্রতিটি লেখায় তুলে এনেছেন বিবর্তনবাদের মৌলিকত্বকে। তিনি বারবার বলেছেন- এখন পর্যন্ত একটি ফসিলও ভুল জায়গায় আবিষ্কৃত হয়নি যেটি বিবর্তনবাদকে ভুল প্রমাণ করতে পারে!

বিজ্ঞান গতিশীল, যে গতিশীলতা প্রজাতিগুলোর পারস্পারিক সম্পর্ক নির্দেশ করে। হাজার বছরের বিশ্বাসকে লালন করার

নাম বিজ্ঞান নয়, বিশ্বাসকে যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যবচ্ছেদ করা এবং তার সত্যতা বা মিথ্যাচারকে সত্যের আলোকে উন্মোচন করাই বিজ্ঞানের কাজ।ডারউইনবাদ আর বিবর্তন এতটাই প্রমাণিত যে সেটি ঘটেছে কি ঘটেনি তা নিয়ে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

হাজার হাজার বছর ধরে ঈশ্বর আশ্রিত ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে পারেননি ডারউইন, বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা না করলে হয়তো যাজকই হতেন বা ধর্ম তত্ত্বের অধ্যাপক হতেন, আবার মন থেকে জীব সৃষ্টির সেই ঈশ্বরের তত্ত্ব মেনে নিতেও পারেননি ডারউইন। হাজার হাজার বছর ধরে যে ধর্ম ঘিরে রয়েছে পৃথিবীকে (থুড়ি পৃথিবী বললে ভুল হবে এশিয়া-আরব-ইউরোপকে। কারণ আমেরিকা ওসেনিয়া মহাদেশের কথা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগ্রন্থতে ছিলোনা। ১৫২৬ সালের আগে আমেরিকায় সভ্য মানুষের পদার্পন ঘটেনি। শেষ সংগঠিত ধর্ম ইসলামের জন্ম ৬০০ সাল নাগাদ। ডারউইন ধর্মের আলোকে জীবের সৃষ্টির উত্তর পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলেন, কিন্তু অশান্ত মনকে শান্ত করতে পারলেন না। পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক জন লকের বিখ্যাত উক্তি "বস্তু থেকে চেতনার উদ্ভব" আবার তাঁকে অশান্ত করে তুললো। সুযোগ পেলেন জীব বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার, চাপলেন বিগল নামের জাহাজে গ্যালাপাগাস দ্বীপে যাওয়ার জন্য। গ্যালাপাগাস দ্বীপে তিনি বিভিন্ন জীবজন্তুর সন্ধান পেলেন এবং হাজার হাজার জীবাশ্মের সন্ধান পেলেন, প্রায় ২৫০০০ জীবাশ্ম পাঠিয়ে দিলেন ইংল্যান্ডে। দীর্ঘদিন সেগুলি

পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এলেন জড় পদার্থ থেকেই জীবের উৎপত্তি এবং তার ক্রমবিকাশের শেষ পর্যায়ে মানুষের উৎপত্তি। তিনি লিখলেন "the origin of species by means of natural selection,of the preservation of favoured races in the struggle for life"। এই বইটা বেরোনোর সাথে সাথে সংগঠিত ধর্মের বিকৃত মানুষেরা প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু করলো। কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, জিওনার্দো ব্রুনোর পর ডারউইনের এই আঘাতে প্রবল প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিতই ছিল। ইংল্যান্ডের ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা তাঁকে নানানভাবে অপদস্থ করা থেকে প্রাণে মারতেও চাইলেন। শুধু প্রাণে মারতে পারেনি কারণ ডারউইনের সমর্থনে ঈংল্যান্ডের কিছু বিখ্যাত অভিজাত পরিবারের মানুষ দাড়িয়েছিলেন। (আমাদের দেশের বিখ্যাত চিকিৎসক সুশ্রুতের শল্য চিকিৎসা যখন ব্রাহ্মণদের নেতা যাজ্ঞবল্ক বন্ধ করে দিলেন তখন কিন্তু তিনি কারো সমর্থন পাননি, নয়তো ভারত আজ চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেক দূর এগিয়ে যেতো) এদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় টমাস হাক্সলি, শল্য চিকিৎসক ডাঃ ওয়েনের কথা। টমাস হাক্সলিকে ডারউইনের ডালকুত্তা নামেও অভিহিত করা হয়।

দর্শনের যে মূল সঙ্ঘাত সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ডারউইন। ধর্মে জীব সৃষ্টিতে ঈশ্বর আছেন। কিন্তু ডারউইনের বইতে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ঈশ্বর নেই আছে "প্রকৃতি ও পরিবেশ"। ঈশ্বরের ঠাঁই নেই সেখানে। সেসময় ডারউইনকে কি পরিমাণ আক্রমণ হজম করতে

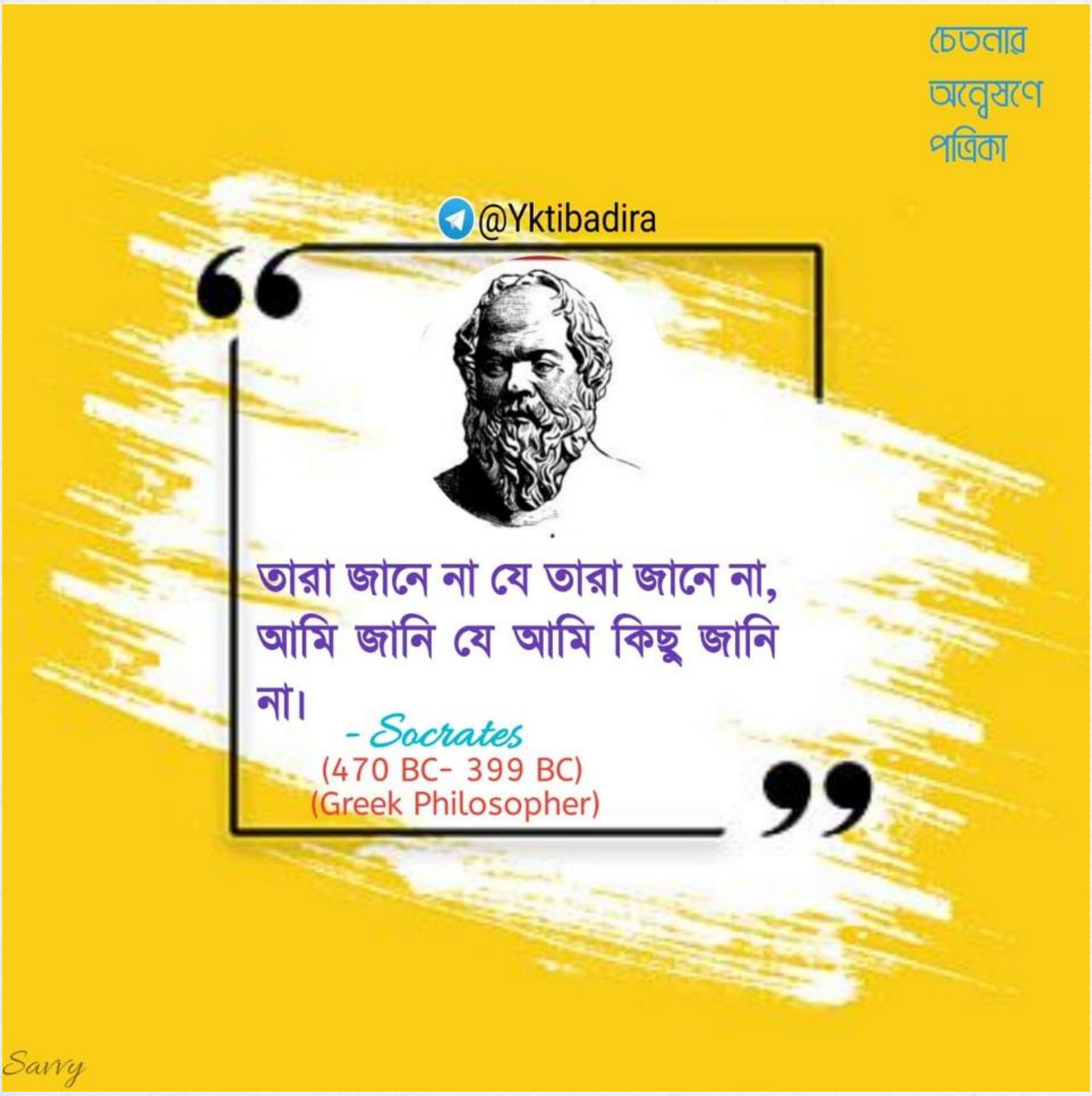
হয়েছিল নীলকন্ঠ হয়ে তা এখন ভাবা যায় না। এই ধর্মান্ধ কীটেরা কি ভয়ানক তা আজ ভারত পাকিস্তান বাঙলাদেশের আমাদের মত উদ্বাস্তুরা ও মুক্তমনারা জানে, জানে অভিজিত রায় রাজিব ওয়াশিকর নাজিমুদ্দিন নিলয় বা আমাদের দেশের দাভালকার-পানেসর-কালবুর্গী-খলিল-গৌরি লঙ্কেশ। সারা আরবের সিরিয়া,জর্ডন, ইরাক, তুরস্কের উদবাস্তুরা জানে, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের উদ্বাস্তুরা জানে ।

এই সব উদ্বাস্তুদের তথাকথিত কোন ঈশ্বর –আল্লাহ-গডেরা রক্ষা করেনা। আমেরিকাতে ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়ানোর জন্য শিক্ষকের শাস্তি হয়েছিল, যা মাঙ্কি ট্রায়াল নামে সারা পৃথিবীতে খ্যাত।

আমার মনে হয় পৃথিবীতে অনেক প্রখ্যাত পদার্থ বা রসায়ন বৈজ্ঞানিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, সভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছেন অনেকদূর।কিন্তু বিজ্ঞানের কাজের প্রভাব বিজ্ঞান ছাড়িয়ে সমাজ, ধর্ম, শিল্প, সংস্কৃতি ও রাজনীতির জগতকে সব থেকে আলোড়িত করেছিল চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ।ডারউইনের উপর সারা পৃথিবী জুড়ে সংগঠিত ধর্মের একের পর এক আক্রমনই এর সব থেকে বড় প্রমাণ। একারণেই সংগঠিত ধর্ম কোনোদিনই ডারউইনকে পছন্দ করেনি বরং বিরোধীতা করে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের ইসলামিক ধর্মগুরুরা বলেছেন বিজ্ঞান পড়ান, কিন্তু বিবর্তন পড়ানো চলবেনা।

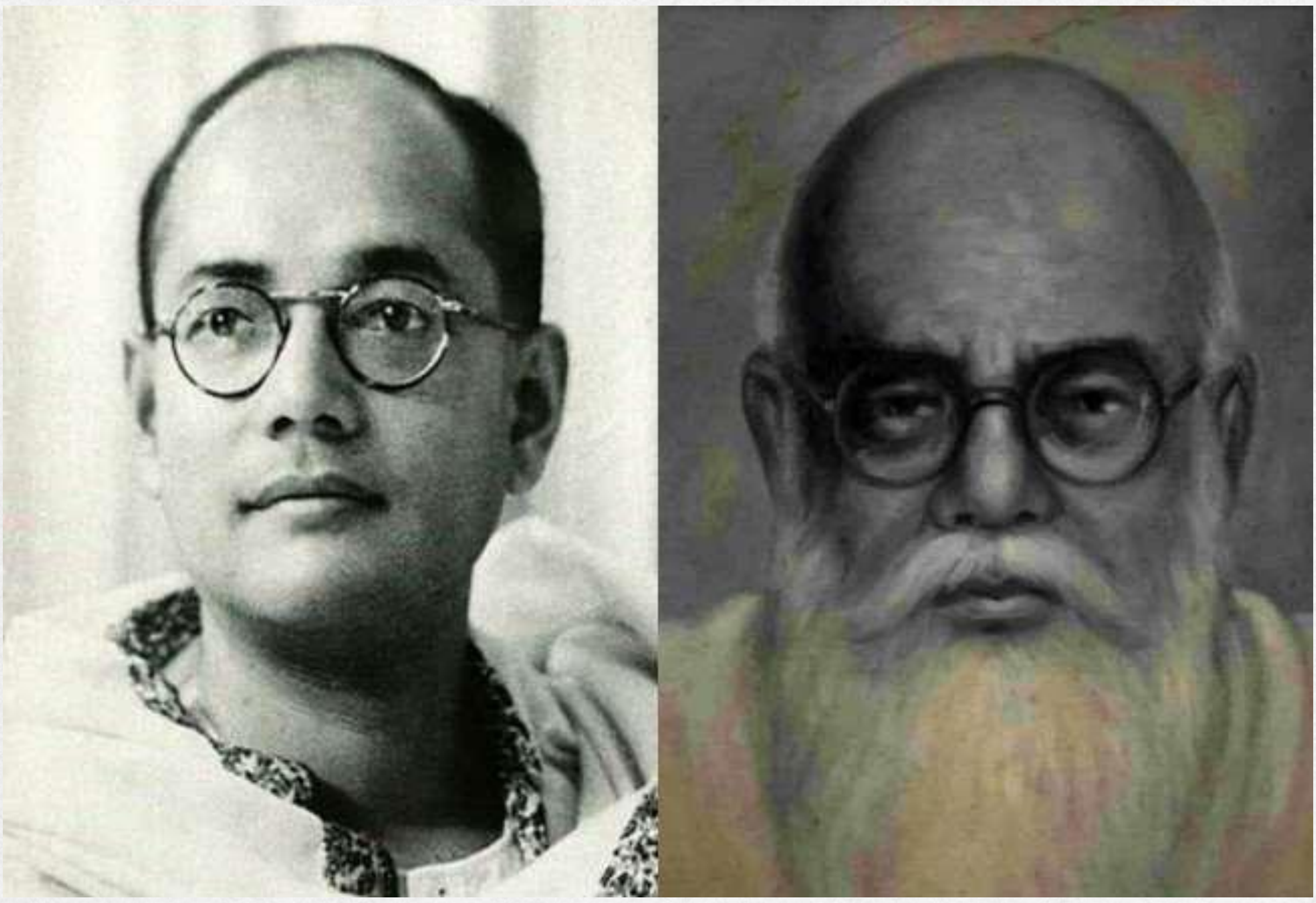
ওরা জানে বিবর্তন পড়ালে অন্য ধর্মের সাথে ইসলামের আল্লাহ নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। আর কোরানেইতো বিবর্তন এর প্রমাণ আছে। আল্লাহর সৃষ্ট প্রথম মানব আদম 60 হাত থেকে বর্তমানের সর্বোচ্চ আট ফুট হয়ে যায়। এটাই তো বিবর্তন। এটা মাদ্রাসার হুজুরদের বোঝানো যাবেনা।



সূচিপত্র

গুমনামী বাবা এবং নেতাজি সুভাষ বোসের যোগস্থাপন ~ তথ্যের মিথ্যাচার

লি খে ছে ন – স ঞ্জ য় উ বা চ



বাঙালি তথা আপামর ভারতবাসীর অবিসংবাদী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ের অগ্রগণ্য সেনানী আমাদের প্রাণের নেতাজি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অহিংস নীতির বিরোধিতা করে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বিরোধী দেশগুলির সাহায্যে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মশাল জ্বেলে দিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালের ১৮ই

অগাস্ট তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায় ওঁর মৃত্যুর খবর এখনও কোনও বাঙালি বিশ্বাস করতে চায় না। আমাদের মনের মণিকোঠার বীর যেন আক্ষরিক অর্থে অমর।

প্রায় ৭৫ বছর পরেও বাঙালীর মনের মনিকোঠায় বীর সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে তৈরি হওয়া কল্পকাহিনী আরও নতুন নতুন আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে।

অন্তর্ধান রহস্য সমাধানে -

৩০শে অগাস্ট ১৯৪৫ জাপানের আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরেই এডমিরল মাউন্টব্যাটেন জেনারেল ম্যাকআর্থরর্কে নেতাজির মৃত্যুর তদন্তের যে নির্দেশ দেন- তার রিপোর্টেও বিমান দুর্ঘটনার তত্ত্বই সামনে এসেছে। স্বাধীন ভারতে নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে গঠিত তিনটি কমিশনের দু'টিতে (শাহনাওয়াজ ও খোসলা কমিশন) বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্য হয়েছে বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। নেতাজি পরিবারও এই দূর্ঘটনার সত্যতা মেনে নিয়েছিলেন। দুর্ঘটনা কবলিত সেই বিমানের চালক, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান, হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সদের সাক্ষ্যের সাথে নেতাজির সঙ্গী ও দেহরক্ষী হাবিবুর রহমান ও দোভাষী নাকামুরার ভাষ্য বিমান দুর্ঘটনার তত্ত্বকেই স্বীকৃতি দেয়।

নেতাজির মৃত্যুরহস্য এবং সন্ন্যাসযোগ -

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের প্রায় ৫০ বছর পর ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী জাস্টিস মনোজ মুখার্জি কমিশন গঠন করেন। দীর্ঘ এত বছর পরে তথ্যপ্রমাণ এবং সাক্ষীদের অনেকেই জীবিত না থাকার দরুন কমিশনের রিপোর্ট কখনই ত্রুটিহীন হবে না।

নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের তদন্তে গঠিত মুখার্জী কমিশনে মৃত্যুর ০৫ টি কারণ নথিভুক্ত করা হয়েছে।

১. লালকেল্লায় গুপ্তহত্যা
২. তাইহোকু বিমান বন্দরে দুর্ঘটনা
৩. ফৈজাবাদের গুমনামী বাবা
৪. শোলমারি আশ্রমের সারদানন্দ
৫. মধ্যপ্রদেশের গুহাবাসী সাধু

এই লেখার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র গুমনামী বাবা ও নেতাজির মিসিং লিঙ্কের সন্ধান।

মুখার্জী কমিশনের গৃহীত সাক্ষ্য অনুযায়ী নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের সাথে তিনজন সাধুর যোগ স্থাপন করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারের ফালাকাটা এলাকার শোলমারিতে সারদানন্দ নামে এক সন্ন্যাসীকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছদ্মবেশী রূপ বলে প্রচার পায়। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রচারের অসারতা প্রমাণিত হয়। সারদানন্দ সাতের দশকে শোলমারি ছেড়ে দেরাদুন চলে যান। কয়েক বছর পরে সেখানেই দেহ রাখেন।



এরপর নেতাজির আত্মগোপনের খবর প্রকাশ পেল উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ শহরে। ১৯৮৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর ফৈজাবাদ শহরের রামভবন থেকে একজন আত্মগোপনকারী সাধু নিখোজ হয়ে যান। এই রামভবনেই ছিলেন গুমনামী বাবা ওরফে মৌনি বাবা ওরফে ক্যাপ্টেন বাবা ওরফে ভগবানজী।

লোকশ্রুতি অনুযায়ী, গুমনামী বাবা সব সময় নিজেকে পর্দার আড়ালেই রাখতেন। তিনি বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায়

কথা বলতেন। দামি পাইপে ধুমপান করতেন। কলকাতা থেকে বাঙালী ভক্তরা প্রায়শই আসতেন এঁর সাথে দেখা করতে।

গুমনামী বাবার অন্তর্ধানের পরে তার ঘরে নেতাজির পরিবারের ছবি, দামি ঘড়ি, পাইপ, বাংলা বই ও প্রচুর চিঠিপত্র পাওয়া যায়। নেতাজির ভাইজি ললিতা বসু দাবি করেন গুমনামী বাবাই সুভাষচন্দ্র বসু এবং উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এর তদন্ত অনুরোধ করেন। জাস্টিস দেশাই এর তত্বাবধানে গঠিত তদন্ত কমিশন সঠিক তথ্য এবং প্রত্যক্ষ সাক্ষীর অভাবে গুমনামী বাবাকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র হিসাবে প্রমাণিত করতে পারেনি।

মুখার্জি কমিশনের ১১৪- ১২২ পাতা ধরে গুমনামী বাবা ও নেতাজির মধ্যে মিল স্থাপনের চেষ্টা করলেও গুমনামী বাবার হাতের লেখার নমুনার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয়। বেসরকারি বিশেষজ্ঞ সেগুলি নেতাজির হস্তলিপি বললেও সরকারি পরীক্ষাগারের অভিমত নেতিবাচক। বাবার রেখে যাওয়া পাঁচটি দাঁতের ডিএনএ পরীক্ষার ফলও নেতিবাচক বেরিয়েছিল।
হাতের লেখা ও দাতের ডিএনএ টেস্ট রিপোর্টে গুমনামী বাবার সুভাষ চন্দ্র বসু হয়ে ওঠা হল না।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, জাস্টিস মনোজ মুখার্জি কমিশন এবং জাস্টিস বিষ্ণু সাহাই কমিশন আত্মগোপনকারী সাধুকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু হিসাবে স্বীকৃতি দেননি।

খুনের আসামীর যোগ -

গুমনামী বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর ৮ই নভেম্বর ১৯৮৫ এ হিন্দি দৈনিক 'অমৃত প্রভাত' এবং 'জনমোর্চা' প্রতিবেদন প্রকাশ করে জানায় যে, ১৯৫৮ সালে কে.ডি উপাধ্যায় ওরফে ক্যাপ্টেন বাবা পণ্ডিত ব্রম্মদেব শাস্ত্রীকে হত্যা করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। লোকশ্রুতি অনুযায়ী কেডি উপাধ্যায় কিছুদিন নেপালে আত্মগোপন করার পর উত্তরপ্রদেশের বস্তি এলাকায় ছিলেন। গুমনামী বাবা ও বস্তি এলাকা থেকেই ফৈজাবাদে এসেছিলেন। কেডি উপাধ্যায় এবং গুমনামী বাবার মিসিং লিঙ্ক শেঠ ঈশ্বরদাস বেণীপ্রসাদ।

ব্রম্মদেব শাস্ত্রীর ভাই সূর্যনারায়ন মিশ্রার আত্মজীবনীতে শেঠ ঈশ্বরদাস বেণীপ্রসাদের উল্লেখ আছে - কেডি উপাধ্যায়ের স্কুলের অন্যতম আর্থিক সহায়তাকারী হিসাবে। অপরদিকে গুমনামী বাবার অন্যতম ভক্ত ডক্টর আর.পি.মিশ্রার কথায় শেঠ ঈশ্বরদাস বেণী প্রসাদ গুমনামী বাবার প্রকৃত পৃষ্টপোষক ছিলেন।

তাহলে আত্মগোপন করে থাকা গুমনামী বাবা আসলে একজন পুলিশের খাতায় ফেরার আসামি। এই ঘটনা সত্যি হলে যে

বা যারা একজন খুনের আসামীকে ভারতের বীর সন্তান নেতাজির নাম যুক্ত করতে চাইছেন তারা একপ্রকার অপরাধ করছেন।

গুমনামী বাবার RSS সখ্যতা -

জয়বাবা ফেলুনাথ গল্পে হরিদ্বার ঘাটে মছ্লিবাবাকে সাজিয়ে জনসাধারণের সামনে এনেছিলেন দুর্ধষ মগনলাল মেঘরাজ। রামভবনে গুমনামী বাবার মাহাত্য প্রচারের প্রতিটা অধ্যায় যুক্ত করেন বিজেপি নেতারা।

স্বাধীন ভারতবর্ষের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলা সাম্প্রদায়িক বিতর্কের কালো অধ্যায়ের যোগ রয়েছে ফৈজাবাদের এই রামভবনের সাথে অযোধ্যার বাবরি মসজিদে রামলালামূর্তি স্থাপন করেন রামভবন -এর গুরুদত্ত সিং।

গুরুদত্ত সিং -এর পৌত্র ঠাকুর শক্তি সিং বর্তমানে BJP নেতা এবং জাস্টিস সহায় কমিশনে পিটিশনে দাবি করেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু গুমনামী বাবার ছদ্মবেশে রামভবনে আত্মগোপন করেছিলেন।

গুমনামী বাবার ঘর থেকে উদ্ধার হওয়া RSS এর সংঘচালক গোলওয়ালকারের লেখা চিঠি গুমনামী বাবার সাথে RSS এর যোগ স্পষ্ট করে দেয়।

অনুমান করা যেতেই পারে যে, রামভবনের ছাদে গেরুয়া পতাকার পালে হাওয়া লাগিয়ে গুমনামী বাবা BJP-RSS এর সযত্নে লালিত হয়েছিল এবং মৃত্যুর পরে তাই নেতাজির মৃত্যু রহস্যে নতুন মোড় এনে দেয়।

কারণ -

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দুমহাসভার ভূমিকা সর্বদাই ব্রিটিশদের চাটুকারিতা করেই কেটেছে। তাই বিজেপির মেকি জাতীয়তাবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সারির কোনও নেতার অবলম্বন দরকার। ৩০০০ কোটি টাকার স্ট্যাচু তৈরি করে সর্দার প্যাটেলকে পন্ডিত নেহরুর তুলনায় বড় প্রমাণ করার চেষ্টা।

নেতাজির এই আকস্মিক অন্তর্ধান দেশবাসী আজও মেনে নিতে পারেনি। নেতাজিকে নিয়ে যে বীরগাঁথা আপামর ভারতবাসীর মনের মনিকোঠায় গেঁথে রয়েছে সেই আবেগকে মূলধন করে বিজেপি তার রাজনৈতিক সুবিধা চরিতার্থ করতে চাইছে। বিজেপি ও আর.এস.এস ঘৃণার রাজনীতি দিয়ে পন্ডিত নেহরুকে কালিমালিপ্ত করার লক্ষ্যে অনেকটাই এগিয়ে গেছে।

এরপর এদের লক্ষ্য গান্ধীজি। যারা প্রকাশ্যে জাতির জনকের হত্যাকারীকে পুজো করেন তারা কখনই গান্ধীজির প্রভাবকে স্বীকার করবেন না।

নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে সাধু ছদ্মবেশে হাজির করানো এবং আজাদ হিন্দ সরকারকে মান্যতা দেওয়ার পিছনে এদের গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে। অদূর ভবিষ্যতে দেশের ইতিহাস RSS এর নাগপুর হেড অফিস থেকে ছেপে আসবে - যেখানে লেখা থাকবে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু নন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আর দেশের টাকায় গাঁধীজির ছবি নয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবি যেন অনেক বেশি মানানসই হবে। বিজেপির আইটি সেল ফেসবুক আর সোশ্যাল মিডিয়ায় নেতাজির ছবি সম্বলিত টাকার প্রতিরূপ ছড়িয়ে দিয়েছে। আমরা সাধারন মানুষেরা গান্ধী-নেহরু-বোস এর সম্পর্কের সমীকরণ খুঁজব আর একধরনের আত্মতৃপ্তি লাভ করব বাঙালি হিসাবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে নেতাজির মতন একজন বীরপুরুষ সাধুর ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকার মতন কাপুরুষতার কাজ কখনই করবেন না। গুমনামী বাবাকে নেতাজির সাথে এক যারা করতে চাইছেন তারা পক্ষান্তরে নেতাজির আদর্শকেই কালিমালিপ্ত করতে চাইছেন।

সূচিপত্র

ধ্বংসের বোপীত বীজ ও শেষের অপেক্ষা

লিখেছেন - রাহুল রায়



কিছুদিন আগে উত্তরাখণ্ডস্থিত কেদারনাথ নিয়ে একটি লেখা পড়া হচ্ছিল। কেদারনাথ মন্দিরটি নতুন করে সাজানো হচ্ছে। এতে কিছু মানুষ প্রতিবাদ করছিলেন। অবশ্য তাতে মন্দির কর্তৃপক্ষ কোনও সাড়া দেয়নি যেমন সে রাজ্যের সরকার সাড়া দেয়নি কেদারনাথ মন্দিরের সামনে ছোটোখাটো একটি জনপদ গড়ে তোলার বিরুদ্ধে প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের আবেদনেও। কারণ একটাই, টাকা। গতবছর কেদারনাথ মন্দিরে রেকর্ড ভাঙা ভিড় হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটকরা আসছেন, সঙ্গে আনছেন খরচ করার জন্য টাকা। সেই টাকা

থেকে রাজ্যের অর্থনীতি উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু কথা হল আজকে না হয় দুধ ভাতের পথ বের করা হল, কাল যদি এই মন্দিরটিই কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বলি হয়ে যায় তখন যে দুধ ভাত কি ফেন ভাতও কপালে জুটবে না। কেদারনাথের মতো মন্দির প্রাচীন ভারতের বিস্ময়কর স্থাপত্যের নিদর্শন। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে একে বিপর্যস্ত করে নেওয়াটা স্বাভাবিক ভাবেই সবার পক্ষে মুখ বুজে মেনে নেওয়াটা সম্ভব হয়নি।

প্রকৃতির নিয়মকে তোয়াক্কা না করলে চললে কি হয় প্রকৃতি উত্তরাখণ্ড রাজ্যেই কিছুদিন আগে তার একটি উদাহরণ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। পর্যটকদের অত্যন্ত পছন্দের চামোলী জেলার যোশীমঠ সম্পর্কিত ঘটনাক্রম জনমানসে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ হিমালয়ের ধ্বস সংক্রান্ত নানা দুঃসংবাদ সচেতন সব মানুষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পাহাড়বাসী সাধারণের জনজীবন যারপরনাই বিপর্যস্ত। এই বিপর্যয় একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি একটি সুদীর্ঘ কাল যাবৎ বিপথগামী যাপনের ফল। সুউচ্চ তরুশ্রেণী দ্বারা আচ্ছাদিত হিমালয়ের পর্বত গাত্র। বরফ গলা নির্মল জল প্রাকৃতিক নিয়মেই পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পথ খুঁজে নেমে আসে তটভূমিতে। পুষ্ট করে নিম্নভূমির নদীর স্বাস্থ্যকে। ভঙ্গুর পাহাড়ের গায়ে অজস্র গাছ গাছালির শেকড়ের বাঁধন ভূমির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। স্থানীয় ভাবে প্রাপ্ত পাহাড়ি গাছের কাঠ দিয়ে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করেন পাহাড়ি জনজাতির মানুষজন। তাদের তৈরী কাঠের বাড়ি যেমন পাহাড়ি শীত প্রতিরোধে সক্ষম, তেমনই ভার কম হওয়ার জন্য পাহাড়ের

ঢালু ভঙ্গুর জমির ওপর মাত্রাতিরিক্ত ভারও প্রযুক্ত হয় না। পাহাড়ের সহন ক্ষমতার মধ্যেই থাকে স্থানীয় গ্রামগুলি। গ্রামগুলির নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গাছের ফাঁকে ফাঁকে পায়ে চলা রাস্তা তৈরি হয়ে যায় পাহাড়কে অক্ষুন্ন রেখেই।

সমস্যা হয়েছে মানুষের কুশিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে আলোর পথ দেখায়, সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু যে শিক্ষা মানুষের বোধশক্তি রহিত করে দেয় তাকে কুশিক্ষা ছাড়া আর কিছু বলার থাকে না। উত্তরাখণ্ডের মানুষ পড়াশোনা করতে বাইরে যাচ্ছেন, সেখানে বিলাসবহুল জীবন, আধুনিক নির্মাণশৈলী দেখছেন, বাড়ি এসে নিজের জীবনে, বাড়িঘরে সেটার প্রয়োগ করতে শুরু করেছেন। বড় বড় বাড়ি, হোটেল অহরহ হচ্ছে। শত-শত গাড়ি টন টন কার্বন নিঃসরণ করে প্রতিদিন যাওয়া আসা করছে। পাহাড় একদিকে সবুজহীন হচ্ছে অন্যদিকে কার্বন একে গরম করে তুলছে। অবশ্য সব দোষ যে মানুষের তাও নয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নিত্য নতুন নিয়ম করে পাহাড়, জঙ্গল সাফ করে নানা রকম প্রকল্প হাতে নেওয়ার আইনতঃ ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। কেদারনাথ মন্দিরের সামনে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের দিন ধ্যান করতেই পারেন, এতে অসুবিধা নেই, ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস নিয়ে থাকার অধিকার একজন ভারতীয় হিসাবে ওঁর আছে। ভারতের মতো দেশে সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে এতে মানুষের আবেগকে নিজের পাশে পাওয়াই যায় কিন্তু প্রকৃতির চিন্তাকে পাশে রেখে

এনটিপিসির তপোবনের মতো বিদ্যুৎ প্রকল্প শুরু করলে প্রকৃতির কিন্তু তার রুদ্র রূপ নিতে পিছপা হবে না। আর সমস্যা হল এখানে ইডি, সিবিআই, পুলিশ, আদালত, আইটি সেল কেউই কিছু করতে পারবে না। রাজ্য সরকারেরও একই অবস্থা। পাহাড়ের মানুষ হয়েও এরা পাহাড় রক্ষার চিন্তা করছে না। পর্যটন ও রাজস্ব বৃদ্ধি করতে গিয়ে পাহাড় কেটে রাস্তা, জঙ্গল সাফ করে নগরায়ন হচ্ছে। রেলের জায়গা খালি করতে সাড়ম্বরে বুলডোজার চালিয়েছেন ভালো কথা, স্থানীয় মানুষের দাবী মেনে একই রকম ব্যবস্থা যদি পাহাড়ে সবুজ ফেরাতে করতেন তাহলে আজ অন্ততঃ এই দিন দেখতে হতো না। এতসবের মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যের সামঞ্জস্য স্বাভাবিক ভাবেই নষ্ট হচ্ছে। প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করছেন না কেন। যোশীমঠের মানুষ করেছিলেন, মাসের পর মাস, বিশেষজ্ঞরা ১৯৭৬ সন থেকেই ততকালীন উত্তরপ্রদেশ সরকার ও পরবর্তীতে উত্তরাখণ্ড সরকারকে সতর্ক করছেন, কেউ কর্ণপাত করেনি। তবে আজকাল আবার প্রকৃতির পক্ষে দাঁড়িয়ে বেশি কথা বলতেও সমস্যা আছে। প্রকৃতি রক্ষার ব্যবস্থা না হোক, সরকারী নীতি রক্ষার্থে প্রতিবাদীদের বিদেশী রাষ্ট্রের টাকায় উন্নয়ন বিরোধী শহুরে মাওবাদী আখ্যা দিয়ে জেলে পুরে দেওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু পাকাপোক্ত করা হয়েছে।

পর্যটনের বিকাশের নামে বিপুল মানুষ বছরভর পাহাড়ে আসছেন। ফুলে ফেঁপে উঠছে ব্যবসা। মুনাফাপ্রেমী ওই এক

শতাংশ মানুষের লোভী দৃষ্টি এসে পড়েছে পাহাড়, জঙ্গলে। পর্যটন বিস্তারের নামে প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে পাহাড়ের ভঙ্গুর ঢালু গা বেয়ে গড়ে উঠছে চওড়া রাস্তা, সেতু কংক্রিটের মহোৎসব। সেই রাস্তার ওপর দিয়ে শ'য়ে শ'য়ে চলেছে পর্যটক ভর্তি গাড়ি। পর্যটকদের জন্য শত শত হোটেল খুলে রাখা মালিক, রিসর্ট মালিক, পর্যটকদের ব্যবহার করা গাড়ির মালিক হলেন ওই এক শতাংশ। এদের চাঁদায় নির্বাচন তরী পেরিয়ে আসা জনপ্রতিনিধিরা এদের বিরোধিতা না করে বরং নীরবে অংশীদারত্বের পথ নেন। তাঁরা বেমালুম ভুলে যান যে এই রাস্তার ভার, এই গাড়ির ভার, এত মানুষের ভার বহনে সক্ষম নয় হিমালয়ের ভঙ্গুর পাহাড়ের গা-গুলি। উপরন্তু রাস্তা, কংক্রিটের সেতু, হোটেল, রিসর্ট বানানোর সুপ্রশস্ত জায়গা পাওয়ার জন্য নির্বিচারে বলি হচ্ছে সুপ্রাচীন বৃক্ষ রাজি। শেকড়ের প্রাকৃতিক বাঁধন হারিয়ে আরও ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে কংক্রিটের ভারে নুয়ে পড়া পাহাড়ের ভূমি। ফল স্বরূপ ধ্বস ও নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়। জীবনহানি, সম্পত্তিহানি, ওই বাকি নিরানব্বই শতাংশের। চকচকে পাহাড়ের চকচকে বিলাসবহুল শহরের প্রয়োজনে চাই ঝকঝকে আলো। আলোর প্রয়োজনে চাই বিদ্যুৎ। অতএব পাহাড়ি নদীর ওই দুর্দম গতিকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ এর পরিকল্পনা। নদীর ওপর আবার কংক্রিট, বাঁধ নির্মাণ। বাঁধের জমে থাকা জলে পাহাড় গায়ের অসম ভার বৃদ্ধি। আবার পাহাড়ের ভারসাম্যের বিঘ্ন। প্রকৃতিকে শাসন করার এই ভ্রান্ত চর্চা একটি চলমান প্রক্রিয়া। পৃথিবীর ধ্বংস প্রাপ্তি পর্যন্ত অবিরল গতিতে চলতেই থাকবে।

আর ওই এক শতাংশ খুঁজে বেড়াচ্ছে চাঁদে, মঙ্গলে উপনিবেশ গড়ার জায়গা। আরো একটি মুনাফার কারখানা। আমরা নিরানব্বই শতাংশ এই দুর্ভোগ নিয়ে অভিযোজন ঘটাতে ঘটাতে বেঁচে রয়েছি। উপযুক্ত চেতনার দ্বারা উপযুক্ত পথের সন্ধান করার প্রয়াসী না হলে বৃদ্ধি আর উন্নয়নের এই কালচক্র থেকে নিস্তার নেই আমাদের, ওই নিরানব্বই এর দলের লোকেদের। আজ যোশীমঠ, কাল উত্তরকাশী, নৈনিতাল একই ঘটনা ঘটতেই পারে। বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই এই দুই জনবসতি নিয়ে সরকারকে গুরুতর সাবধানবার্তা দিয়ে দিয়েছেন। প্রশ্ন হল, এরপর কি শেষ হয়ে যাবে এই ধ্বংস যজ্ঞ? না, হবে না। মানুষ ধ্বংসের বীজ চারিদিকে বোপন করে রেখেছে। তা সে কেদারনাথ মন্দির প্রাঙ্গণই হোক বা বাংলার দার্জিলিং, কালিম্পং বা মেঘালয়ের শিলং। বোপিত বীজ অঙ্কুরিত হতে সময় কম বেশ লাগতেই পারে, কিন্তু হবে যে সেটা নিশ্চিত।

সূচিপত্র

কমিউনিস্ট পার্টি ও বিবর্তনবাদ

লি খে ছে ন – অ নু জ বি শ্বা স



কলকাতায় হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে একটা খবর, চির রোমান্টিক বিপ্লবী আর্নেস্তো চে 'র মেয়ে অ্যালেইদা আসছেন আর তাঁকে গণ সম্বর্ধনা দেবে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি। কেন? আর্নেস্তো চে গুয়েভারার মেয়ে বলে? কিন্তু তিনি তো বিপ্লবী নন, বিপ্লবী তথা সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী তো তাঁর বাবা। তাহলে অ্যালেইদাকে নিয়ে এতো নাচানাচি কেন? কমিউনিষ্ট পার্টি তো পরিবার তন্ত্রে বিশ্বাস করে না।

জন্মলগ্ন থেকে কমিউনিষ্ট পার্টি বিশ্বাস করে মানব বিবর্তনের প্রথমতত্ত্বে: শ্রেণী সংগ্রাম বা class struggle তথা ডারউইনের struggle for existence মন্ত্রে। স্বয়ং মার্ক্স চিঠি লিখে ডারউইনের কাছ থেকে এই 'শ্রেণী সংগ্রাম' শব্দটি ধার নিয়েছিলেন। এটা ছাড়া মানব সভ্যতার ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যেত। এতদিন ধরে কমিউনিষ্ট পার্টি তার কথা রেখেছে, একনিষ্ঠ চিত্তে ডারউইনবাদ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। গরীব বড়োলোকের মধ্যে দিয়ে আন্ত:প্রজাতির সংগ্রাম, নিজের শ্রেণীর লোকেদের একত্রিত করানোর মধ্যে দিয়ে আন্ত:প্রজাতির সংগ্রাম আর রক্তমাংসের শরীর নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়ে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করেছে।

অ্যালাইদার মধ্যে দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি প্রবেশ করল বিবর্তনের দ্বিতীয় তত্ত্বে, ল্যামার্কের অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুশরন বা inheritance of the Acquired Characters মন্ত্রে। কমিউনিষ্ট পার্টির বর্তমান প্রজন্মের মনে হয়েছে অ্যালাইদা যেহেতু আর্নেস্তো চে গুয়েভারার মেয়ে তাই তার মধ্যে বাবার চির বিপ্লবী রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। বৈপ্লবিক চিন্তাধারা একটি অর্জিত বৈশিষ্ট্য যা অ্যালাইদা তার বাবার রক্তের মধ্যে দিয়ে পেয়েছেন। সমকালীন বিশ্বে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি আর্নেস্তো চে কে ডাক্তার থেকে রোমান্টিক বিপ্লবীতে পরিণত করেছিল। এক হাতে শত্রুর বিরুদ্ধে রাইফেল অন্য হাতে কমরেডের জন্য স্টেথোস্কোপ, শত্রুর সাইকোলজি বুঝে ফাঁদ পেতে অতর্কিত গেরিলা আক্রমণ

পদ্ধতি আবিষ্কার করা আর্নেস্তো চে গুয়েভারার মেয়ের মধ্যেও যে তার বাবার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে সে কথা একটা শিশুও বোঝে, কমিউনিষ্ট পার্টিও বোঝে। কিন্তু স্বীকার করতে কয়েক



দশক সময় লাগিয়ে দিল। অ্যালাইদার মধ্যে দিয়ে সাম্যবাদের রঙ্গমঞ্চে পরিবারতন্ত্র নামক ভীমের গদাহস্ত প্রবেশ ঘটিল, থুড়ি স্বীকৃতি পাইল।

এখন বাকি থাকল হুগো দা ভ্রিসের মিউটেশন তত্ত্ব। এটা inter caste বা inter racial marriage ছাড়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ অন্যদল তথা অন্য মতাদর্শের লোকজনকে ভাঙিয়ে নিজেদের দলে নিয়ে এসে তাদের ক্রোমোজোমে মার্ক্সবাদ মিশিয়ে কোষ বিভাজন ঘটানো ছাড়া রাজনৈতিক মিউটেশন সম্ভব নয়। এখনও পর্যন্ত এমন সম্ভাবনা চোখে না পড়লেও ভবিষ্যতে কী হবে তার উত্তর একমাত্র সময় বলবে।

সূচিপত্র

মাস্টারবেশন, অর্গাজম এবং নারীর শরীর

লিখেছেন- পার্থপ্রতীম পাল



মাস্টারবেশনের যুতসই একটা ভদ্র বাংলা শব্দ পেয়েছিলাম অনেক খুঁজে পেতে, সেটি হচ্ছে - স্বমেহন! যেটিকে বেশীরভাগ বাঙালি বলে থাকে হস্তমৈথুন। ঠিক কবে মনে নেই, তবে বয়ঃসন্ধির কোনও একদিন একসাথে কয়েকটি দেশ মহাদেশ আবিস্কারের মজা পেয়েছিলাম নিজের শরীরে। একটি ক্ষুদ্র অঙ্গানুতে আঙুল ছুঁইয়ে সে এক তিরতিরে

অনুভূতি! তখনও জানতাম না ব্যাপারটা কি ঘটছে বা কি ঘটাচ্ছি। জানতে লাগল কয়েক বছর।

এদেশের বেশীরভাগ পুরুষের চোখে অশ্লীল, গোপনীয়, লজ্জার বিষয়টি হচ্ছে নারীর যৌনাঙ্গ। যারা নারীর যৌনাঙ্গ বলতে শুধু ভ্যাজাইনা বা যোনীকে বোঝেন তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি - নারীর যৌনাঙ্গের ওপর একটি ক্ষুদ্র ত্রিকোণাকার অঙ্গ থাকে যেটির নাম ভগাঙ্কুর। নারীর স্বমেহন বা মাস্টারবেশান মূলত ভগাঙ্কুরকে ঘিরেই। এটির ওপর আঙুলের স্পর্শেই জেগে উঠতে পারে নারী শরীর, ঘটতে পারে অর্গাজম। অর্গাজমের বাংলা নাম হচ্ছে রেতঃপাত।

মানুষ মঙ্গলে বসতি স্থাপনের চিন্তা করছে, তারায় তারায় রটিয়ে দিচ্ছে তার জয়ধ্বনি অথচ নিজের শরীরের রহস্য কতোটা আবিষ্কার করতে পেরেছে? হতভম্ব হওয়ার মতন বিষয় হচ্ছে নারী শরীরের ভগাঙ্কুর আবিষ্কার হয়েছে বলতে গেলে অনেক সম্প্রতি। রিয়াল্ডো কলাম্ব নামের ইতালিয় একজন ডাক্তার ১৫৫৯ সালে একটি ডাক্তারি বই লেখেন যার নাম হচ্ছে 'De Re Anatonial'। বইতে তিনি ভগাঙ্কুরের কথা উল্লেখ করেন, আরও বলেন - এটি একটি সুন্দর এবং দরকারি জিনিস। এরও দুই বছর পর ১৫৬১ সালে গ্যাব্রিয়েলো ফেলোপিন্ড নামের আরেক ইতালিয় ডাক্তার দাবি করেন তিনিই প্রথম ভগাঙ্কুর আবিষ্কার করেছেন!

ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায় খোদ উপমহাদেশের নারীদের এই অঙ্গটি কেটে নেওয়ার প্রচলন ছিল দুই'শ বছর আগেও। আফ্রিকান উপজাতিদের মধ্যে ব্যাপারটি আরও প্রচলিত ছিল। তারা নারীকে যৌন আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে এটি করত। তবে অবাক হতে হয় যখন দেখি ইউরোপের মতন জায়গায় উনিশ শতকেও চলেছে ভগাঙ্কুর ছেদন! আরও অবাক করা হচ্ছে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতন লোক বলেছেন - নারী শরীরের যোনি থেকে ভগাঙ্কুর ছেদন করা উচিত! এক্ষেত্রে তার যুক্তি হচ্ছে - নারী যদি নিজেই নিজের শরীর থেকে যৌন আনন্দ পেতে পারে তাহলে তার কাছে পুরুষ সঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা কমবে। পুরুষ সঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা কমে গেলে সমকাম মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠতে পারে! জীনানুক্রমে বয়ে আনা পুরুষতন্ত্র যে সিগমুন্ড ফ্রয়েডকেও ছাড়েনি তার যথার্থ প্রমাণ এটি।

প্রশ্ন উঠতে পারে নারীর অর্গাজম কী কাজে লাগে? পুরুষের অর্গাজম যেমন ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার কাজে লাগে নারীর অর্গাজম তো তেমনটি নয়। নারীর অর্গাজম না ঘটলেও নারী সন্তান ধারণ করতে পারে। সন্তান জন্মদানেও বিঘ্ন ঘটে না। এদিকে পুরুষের অর্গাজম ঘটতে যেমন সময় নেয় দুই বা তিন মিনিট, সেখানে নারীর অর্গাজম ঘটতে সময় নেয় প্রায় পনের থেকে বিশ মিনিট। তাহলে নারীর অর্গাজমের গুরুত্ব কোথায়? অর্গাজম মানে কি শুধুই নারীর যৌনতৃপ্তি?

ব্যাপারটা আসলে তা নয়। আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিতভাবে সফল অর্গাজম নারীর শরীরের জন্য বেশ ভালো। কেন না এতে প্রাণায়াম জাতীয় শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত ব্যায়াম হয়, শরীরের হরমোনাল গ্ল্যান্ডে প্রচুর পরিমাণে অক্সিটোসিন ও প্রোল্যাক্টিন উৎপন্ন হয়, হৃদপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণ রক্ত চলাচলকে গতিশীল করে। অর্গাজম ঘটা নারীর ক্ষেত্রে অক্সিটোসিনকে বলা হয় লাভ (Love) হরমোন, যা যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করে, শরীর মন প্রফুল্ল রাখে, মুখের বলিরেখা পড়তে দেয় না। অন্য দিকে প্রোল্যাক্টিন হরমোন অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহকে স্বাভাবিক রাখে, মাতৃদুগ্ধ উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে।

শুধুমাত্র পুরুষ সঙ্গীর সাথে সঙ্গমে নয়, মাস্টারবেশান বা স্বমেহনে, নানারকম যোগ ব্যায়ামের মাঝেও ঘটতে পারে অর্গাজম বা রেতঃপাত। আমরা জানি মানবশরীরের বংশগতির ধারক ও বাহকের নাম ডিএনএ। সফল অর্গাজম ডিএনএ’র ক্ষয়িষ্ণু জীনগুলির মৃত্যু রোধ করে, যৌবনকে স্থায়ী করে, শরীরের বায়ো-রাসায়িক ক্রিয়ায় তৈরি ফ্রি র্যাযডিকেলস এবং নানাপ্রকার জার্মস বিলুপ্ত করে। এমনকি স্লোয়ান কেটারিঙয়ের আধুনিক গবেষণা বলছে রেডিয়েশান ল্যাব পরীক্ষায় দেখা গেছে ক্যান্সার প্রতিরোধেও অর্গাজম নিঃসৃত অক্সিটোসিন বেশ বড় ভূমিকা পালন করে থাকে।

শেষ কথা হচ্ছে- ২০০৭ সাল থেকে প্রতিবছর ৮ আগস্ট



হলো 'ইন্টারন্যাশনাল ফিমেল অর্গাজম ডে' বা 'আন্তর্জাতিক নারী রেতঃপাত দিবস'। নরওয়ে, মেক্সিকো, পেরু, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, স্পেনসহ বিশ্বের নানা দেশে ছুটির দিন হিসেবে ঘটা করে পালিত হয় এই দিনটি। দিনটি উৎসর্গ করা হয় পৃথিবীর সব নারীর যৌন আনন্দ পাওয়ার স্বাধীনতার পক্ষে। বাংলাদেশে নারীর জন্য মা দিবস, নারী দিবস, কন্যা দিবস, মাতৃদুগ্ধ দিবস পালিত হয়ে আসলেও নারীর যৌনতা সম্পর্কিত অজ্ঞতা, কুসংস্কারবোধ ও পুরুষতান্ত্রিক লজ্জাবোধ মনোভাবের কারণে এই দিবস সম্পর্কে প্রায় কেউই কিছু জানেনা। নারীর যৌনতার বিষয়টি এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত, অবদমিত।

নারীর অর্গাজম হচ্ছে নারী শরীরের চরম পুলকের অনুভূতি। রোগ প্রতিরোধ, টেনশান রিলিজ থেকে শুরু করে যার শরীরবৃত্তীয় ভূমিকা অসংখ্য। অথচ যুগ যুগ ধরে চলে আসা পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে এদেশে নারীদের কাছে লজ্জা ও অশ্লীলতাজনিত আতঙ্কের বিষয় হয়ে উঠেছে অর্গাজম।

নারী, তোমার সম্মান যোনীতে তালাবদ্ধ করে রাখায় নয়। বরং তোমার যৌনতার অনুভূতি যে অশ্লীল, নিগৃহীত, লজ্জাকর কিছু নয় - তা প্রমাণে। তোমার সম্মান তোমার জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় আর মুক্তমননে! তাই চাই - এদেশের নারীরা সঙ্গীর সাথে হোক বা নিজে, অর্গাজম নামের সুখের উঠোনে পা ফেলুক, নিজেকে বলতে শিখুক - শুভ রেতঃপাত দিবস কন্যা! জগতের সমস্ত আনন্দযজ্ঞে তোমায় নিমন্ত্রণ! নারীও অবদমনকে পেছনে ফেলে সুখের গান গাইতে শিখুক-

"তোমার ভাঁজ খোলো আনন্দ দেখাও
করি প্রেমের তর্জমা
যে বাক্য অন্তরে ধরি
নাই দাড়ি তার নাই কমা!"

শব্দ দূষণ

লিখেছেন - দিবাকর মন্ডল



বছরই রুটিন মাফিক মনসা পুজো থেকে শুরু করে দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং আরো অন্যান্য সমস্ত রকম ধর্মীয় পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠানে (কখনও পারিবারিক কখনও বা সার্বজনীন) যেভাবে মাইক এবং বক্সের শব্দতাণ্ডব চালানো হয় তার থেকে কেউ রেহাই পায় না! ঐসব দিনগুলিতে দিনভর মণ্ডপ ও তার আশপাশে মাইক বাজানো হয়। এ ছাড়াও ভাসানে মাত্রাতিরিক্ত জোরে সাউন্ড বক্স বাজানো ও শব্দ বাজি ফাটানো হয়। প্রকাশ্য রাস্তায় একটি ভ্যানে ১০ থেকে ১২টি সাউন্ড বক্স ও আট-দশটি চোঙা মাইক, সাথে জেনারেটর

একসঙ্গে তুলে তারস্বরে বাজিয়ে উদ্দাম নাচতে নাচতে ভাসানে যাওয়াটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শব্দের তীব্রতা পরিমাপের একক ডেসিবেল (ডিবি)। শব্দের মাত্রা ৪৫ ডিবি হলেই সাধারণত মানুষ ঘুমাতে পারে না। ৮৫ ডিবিতে শ্রবণ শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে এবং মাত্রা ১২০ ডিবি হলে কানে ব্যথা শুরু হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, যদি তিন বছরের কম বয়স্ক শিশু কাছাকাছি দূরত্ব থেকে ১০০ ডিবি মাত্রার শব্দ শোনে, তাহলে সে তার শ্রবণ ক্ষমতা হারাতে পারে। মানুষ সাধারণত ১৫ থেকে ২০ কিলোহার্টজ (KHZB) স্পন্দনের শব্দ শোনে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতানুসারে, সাধারণত ৬০ ডিবি শব্দ একজন মানুষকে সাময়িকভাবে বধির করে ফেলতে পারে এবং ১০০ ডিবি শব্দ সম্পূর্ণ বধিরতা সৃষ্টি করতে পারে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, শব্দবাজি এবং ডিজের আওয়াজে মানুষের শরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলে এবং শ্রবণশক্তি নষ্ট হতে পারে। হৃদ্‌রোগীদের পক্ষেও জোর শব্দ ভীষণ ভাবে ক্ষতিকারক। তাই শব্দ দূষণকে বলা হয় নীরবঘাতক।

আজ আমার রক্ত গরম, আমার বাড়িতে বয়স্ক কোনও লোক নেই, বাচ্চা নেই, বক্স এবং মাইকের মুখ আমার বাড়ির দিকে নয়, তাই আমি গায়ের জোরে উচ্চস্বরে মাইক বক্স চালালে অন্যের ক্ষতি হবে, তাতে আমার কি! এই মানসিকতা নিয়ে

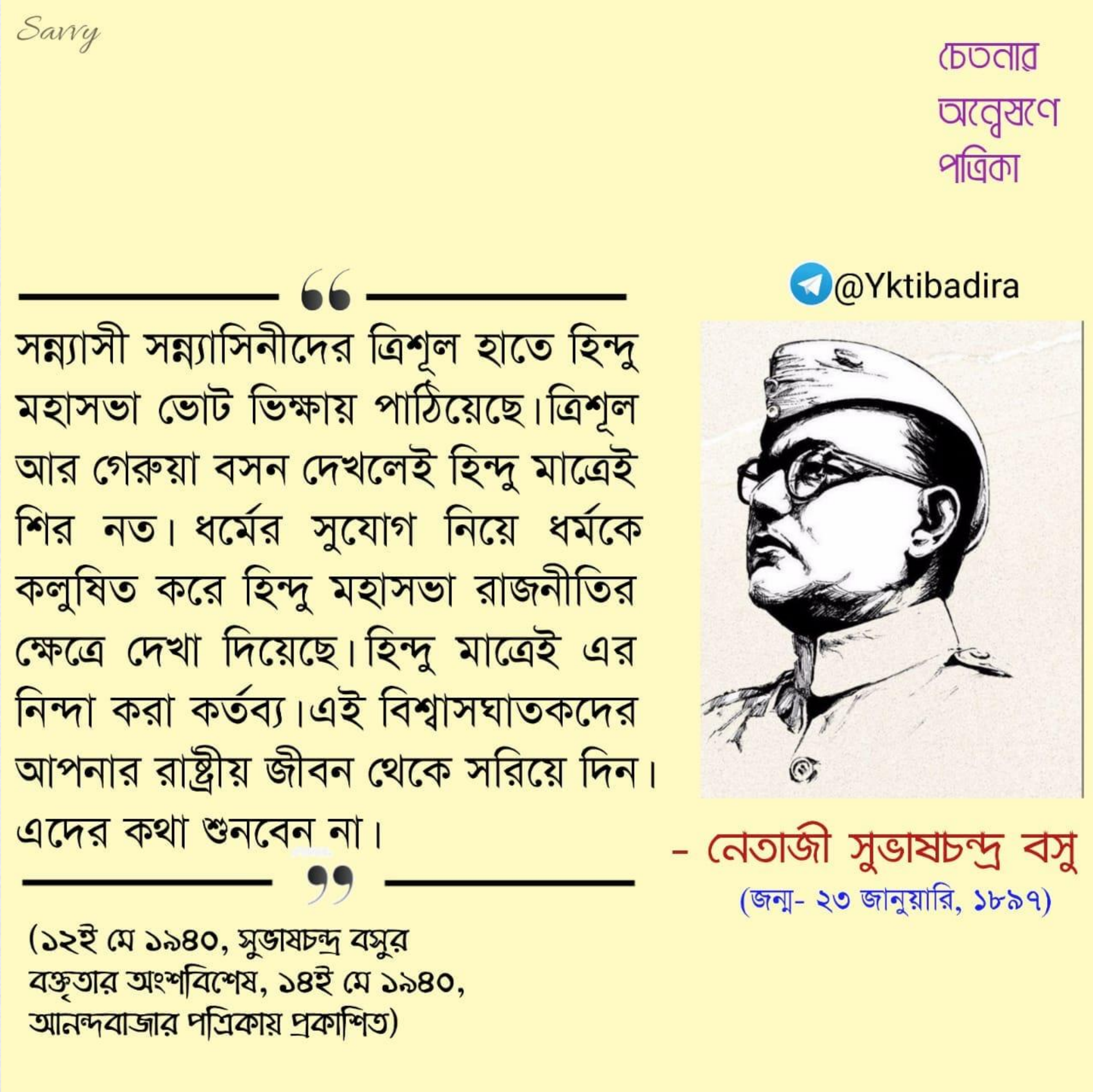
যারা রয়েছেন তাদের বলব আগামী দিনে আপনিও বয়স্ক হবেন, আপনার বাড়ি তো একদিন না একদিন ছোট শিশু জন্মাবে! তখন যদি আগামী প্রজন্ম তাদের রক্তের গরমে চোখ দেখিয়ে আপনার বাড়ির দিকে মাইক বক্স করে উচ্চশব্দে গান-বাজনা চালায় তখন আপনি সহ্য করতে পারবেন তো?



মানবিকতার নামে দানবিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। নিজেদের আনন্দের জন্য যাঁরা আইন ভেঙে সাধারণ মানুষকে সমস্যায় ফেলেন, তাঁদের জন্য আইনের সহায়তা নেয়া একমাত্র উপায়।

তাই বলব সার্বজনীন শুভ অনুষ্ঠান মানবিকতার দিক বজায় রেখেই করুন। আপনাদের অনুষ্ঠানের অর্থ যদি হয়ে থাকে সকলের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী এবং ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখা, অন্যের ক্ষতিসাধন না করা, সকলের মুখে হাসি ফোটানো, তাহলে আশা করব আপনারা শব্দ দূষণকে নীরব ঘাতক হিসেবে ব্যবহার করবেন না। নির্ধারিত নিয়ন্ত্রিত মাত্রা

বজায় রেখে অনুষ্ঠান করুন তাতে সকলেই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবে, সকলের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।



শ্রীমদ্ভাগবতে জাতিভেদের শাস্ত্রকথা

লিখেছেন - সৌরাষ্ট্র দাশ



আমরা সবাই এতোদিন জানতাম যে শূদ্রদের সনাতন ধর্মে অসম্মান তথা পিরিত করেছে, যেটা চোখ বন্ধ করেও হলে সত্য, কিন্তু আজ এক নতুন তথ্য আপনাদের কাছে তুলে ধরবো যা সনাতনী ক্ষত্রিয় বলা ব্যক্তিগণদের একবার চিন্তা করা উচিত তারা কতটা সম্মান পেয়েছে এই সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে? আপনারা সবাই বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। পরশুরাম, সম্পর্কে অবগত [পরশুরাম একুশবার পৃথিবী থেকে

ক্ষত্রিয়শূন্য করেন] এই কথা আমরা সবাই জানি পৌরাণিক গল্প মতে খুব বিখ্যাত কিন্ত এখান থেকেই যুক্তিবাদীদের প্রশ্ন উঠে? প্রথমবার যদি পৃথিবী থেকে ক্ষত্রিয়শূন্য হয়ে থাকে! তাহলে আবার কীভাবে পরশুরাম আরও বিশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন? এখন যদি বলেন সেই কালে বর্ণ ব্যবস্থা জন্ম থেকে নয় কর্ম থেকে তা হলে বলবো! বর্ণ ব্যবস্থা কোনওদিন কর্ম থেকে হতে পারে না। [গীতা - 1:43, 18:41, 4:13, 18:42, 18:43, 18:44, 18:47, 18:48, 3:35] আপনার যদি সনাতন ধর্ম বিষয় একাডেমিক পড়াশোনা থাকে তাহলে এতোগুলি রেফারেন্স পর পর পাশে রেখে পড়েন তাহলে বুঝবেন আমি কী বলতে চাইছি। তবে ব্রাহ্মণ্যবাদের নোংরা চিন্তার জন্য ক্ষত্রিয়রা কোনও দিন ব্রাহ্মণ্যবাদকে মেনে না নেওয়ায় জন্য পরশুরামের সৃষ্টি এবং ক্ষত্রিয় বংশকে ধ্বংস, যেখানে পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের হত্যা করেছে, সেখানে আরেক (রাম) নিরপরাধ শূদ্র শম্বুক হত্যা এর পরেও সনাতন ধর্ম নাকি মহান যখন যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় শূদ্ররা প্রতিবাদ করেছে, ততবার বিষ্ণুর ভিন্ন অবতার নিয়ে দমন হত্যালীলা চালিয়ে গেছে, আর সেই শাস্ত্র ক্ষত্রিয়দের কুকুর বলে মনে করে।

আপনারা জানেন ক্ষত্রিয়রা খুব ধর্মপ্রাণ হয়ে থাকে ধর্মের জন্য সংস্কৃতির জন্য। নিজেদের জীবন দিতে তৈরি থাকে। তার সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের দ্বিজ শাস্ত্র পড়ার অধিকার জন্মগত আছে।

কিন্তু সেই সনাতন শাস্ত্র পড়তে পড়তে, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ পড়লাম, এবং পায়ের নিচে মাটি সরে যাচ্ছে।

[শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ/ ১ম স্কন্ধ/ ১৮ অধ্যায় ৩২-৩৪]

“ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়গণকে দ্বারপাল কুকুর বলিয়াই মনে করেন, তাহারা দ্বারদেশে অবস্থান করিবে, তাহারা কী রূপে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পাত্রস্থ অন্নভোজনের যোগ্য হয়?”

[শ্রীমদ্ভাগবতের ৪ ম স্কন্ধের ৪ম অধ্যায় ৭]

ইশ্বর নিন্দাবাদীর জিহ্বাকে কেটে হত্যার জন্য আদেশ দিচ্ছে।



[শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ১ম স্কন্ধ, ১৩ অধ্যায় ১৫-২৩]

শূদ্রের ধর্মোপদেশ দেওয়াকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখা হত। তাই বিদুরের ক্ষেত্রে জাস্টিফিকেশন দিতে হয়েছে।

[শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ১ম স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায় ১৭-১৮]

“যদি কোনও ভক্ত স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমের অনুষ্ঠেয় ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীহরির চরণাম্বুজের ভজনা করিত করিতে ভক্তির অপক্ক অবস্থাতেই তাহা হইতে বিচ্যুত হন, তথাপি তাহার নীচ যোনিতে জন্মাদির আশঙ্কা নাই।” প্রশ্নঃ নীচ যোনি কোনগুলো? শূদ্র কি নীচ যোনি?



[শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৫ম অধ্যায় ২৩]

দেখা যায়, নারদ একবার এক ব্রাহ্মণের দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করাকে নেগেটিভ ভাবে দেখা হয়েছে বলে মনে হল।

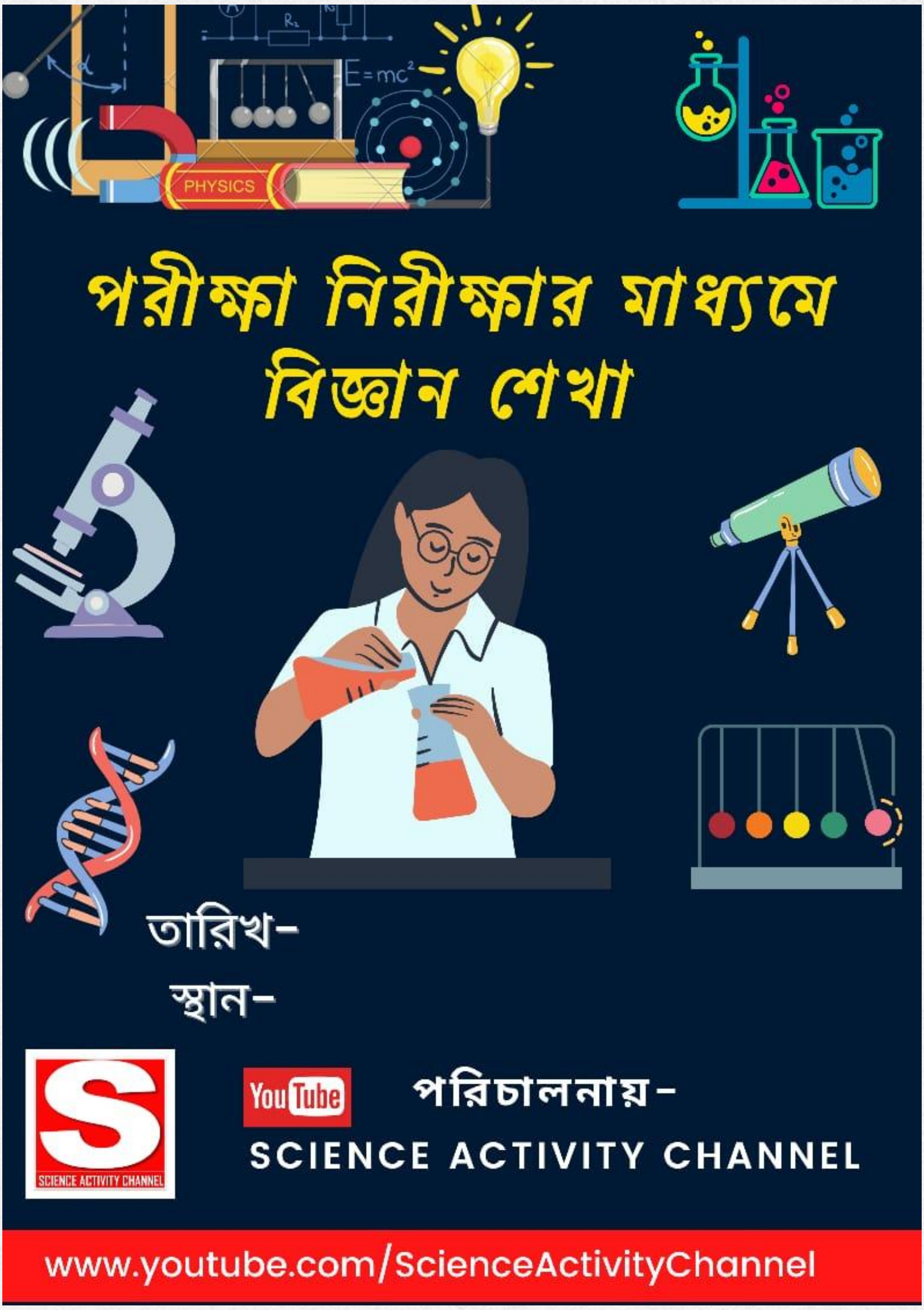
[শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৭ম অধ্যায় ১৬-১৮,৩৩-৪৮]

কৃষ্ণ বিষ্ণুর রূপ ধরে অর্জুনকে বলেন, “ ব্রাহ্মণ অধম হলেও অবধ্য”। এই অধ্যায়ে দেখা যায় অশ্বত্থামা অনেক অপরাধ করলেও তাকে শেষমেষ হত্যা করা হয় না। এই সময় যুক্তি দেওয়া হয়-সর্বস্ব গ্রহণ ও মস্তকমুণ্ডন করে দেশ থেকে নির্বাসিত করে দিলেই অধম ব্রাহ্মণের বধ তুল্য শাস্তি হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই।

এর পরেও লোকে বলে যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নাকি একটি মহান পুরাণ কিন্ত এই পুরাণ কতটা মহান তা এই পুরাণ পড়লে পরে বোঝা যায়।

আমার সম্পর্কে যে ধরনের টুইট করা হয়েছিল তাতে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম... এবং সেটা শুধু ব্যক্তিগত অর্থে নয়, বরং আজকে আমাদের দেশের চতুর্থ এস্টেটের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আমার মনে ভীতির সৃষ্টি করেছিল।

– গৌরী লংকেশ



কোনওরকম খরচাপাতি ছাড়াই বিভিন্ন বিদ্যালয় যোগাযোগ করতে পারে।

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে -

গোপাল মন্ডল

বিজ্ঞান শিক্ষক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মী

যোগাযোগ- 9635-578-948; website

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ: ড্রাগস ও ম্যাজিক রেমেডিজ আইন এবং...

লি খে ছে ন - অ ভি ষে ক দে



গত ১৯/১২/২০২২ -এ সন্ধে ০৭:০০ থেকে রাত ০৯:৩০ পর্যন্ত ছিলাম অনলাইন আড্ডায় যেখানে একটি বিজ্ঞান সংগঠনের কয়েকজন তরুণ-তরুণী, আইনি বিশেষজ্ঞ, ও অভিজ্ঞ বয়স্করা যুক্ত ছিলেন। আলোচনার মূল বিষয় ছিল, The Drugs and Magic Remedies (Objectionable

Advertisements) Act 1954, এবং The Drugs and Cosmetic Act 1940 (Amendment 2020)। আলোচনা হয়েছে তুমুল জমজমাট। সেসবই সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরলাম।

ভারতীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত আইন "The Drugs and Magic Remedies (objectionable advertisement) Act 1954" যা ৩০ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় এবং ১ মে ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় দ্বিতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ের ২৪ নং ক্রমে প্রকাশিত হয়। এই আইনটি ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে ভারত সরকারের Ministry of Health and Family Welfare দ্বারা Amendment হয়েছে। অন্যদিকে, "The Drugs and Cosmetics Act 1940" যার শেষ Amendment হয়েছে ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তে।

উক্ত দু'টি আইনানুসারে মন্ত্র-তন্ত্র, রেইকি, ম্যাগনেটোথেরাপি, জেমথেরাপি, তাবিজ-কবজ, রত্নপাথর, দৈব শক্তি, অলৌকিক ক্ষমতা বা জাদুশক্তি ইত্যাদির দ্বারা কোনও রোগ সারানোর দাবী আইনত অপরাধ। কোনও ওঝা, গুণিন, জানগুরু, সরকারি রেজিস্ট্রেশনবিহীন ভুয়ো ডাক্তার কিংবা প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক (MBBS), অলৌকিক ক্ষমতাধর, দৈব চিকিৎসক, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক ইত্যাদিরা এই আইন ভাঙলে অর্থাৎ

রোগমুক্তির দাবী বা রোগ সারানোর প্রচার করবার জন্য রয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে আজীবন কারাদণ্ডের বিধান অথবা জেল ও জরিমানা দুটোই।

এইখানে জানিয়ে রাখা ভালো, ২৮ নভেম্বর ২০01 সালে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি.সি.প্যাটেল এবং বিচারপতি এ.কে. সিকরি-র ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন, অলৌকিক ক্ষমতা বলে অসুখ বা কোনও সমস্যা সমাধানের প্রলোভন দেখালে জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন প্রকাশক প্রচার মাধ্যমের বিরুদ্ধে যেন "The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954" অনুসারে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করা হয়। সে খবরের সংক্ষেপসার ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২২ জুন ২০0৩ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে - রেইকি বা স্পর্শ চিকিৎসা যাঁরা করেন, তাঁরা নিজের নামের আগে 'ডাক্তার' শব্দটা কোনওভাবেই ব্যবহার করতে পারবেন না। কারণ এই চিকিৎসা পদ্ধতির কোনও সরকারি স্বীকৃতি নেই। স্বাস্থ্যমন্ত্রক স্পষ্ট করে এটাও জানিয়েছে যে, রেইকি সহ জেম থেরাপি, কালার থেরাপি, ম্যাগনেটোথেরাপি, আরোমা থেরাপি, মিউজিক থেরাপি ইত্যাদি তথাকথিত প্রতিটি চিকিৎসা পদ্ধতিই বেআইনি এবং এইসব পদ্ধতি শেখানো কিংবা

প্রয়োগকারী ব্যক্তি কোনও ভাবেই নিজের নামের আগে 'ডাক্তার' শব্দটাকে ব্যবহার করতে পারবেন না।

১৯ মার্চ ২০০৯ সালে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তর একটি নোটিশ জারি করে [GSR 884 (E)] The Drugs and Cosmetics Act (1940) Amendment করেছিল। সেই নোটিশে জানানো হয়েছে, প্রতিটি ওষুধের ওজন, আয়তন, উপাদান সমূহের পরিমাণ ওষুধের লেবেলের গায়ে না সাঁটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। কোনও ওষুধ সেবনের ফলে রোগীর মৃত্যু বা আশঙ্কাজনক ক্ষতি হলে ওষুধ প্রস্তুতকারকের শাস্তি হিসেবে আজীবন কারাদন্ড পর্যন্ত হতে পারে ও দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানাও হতে পারে। এই আইনে "cosmetics" দ্রব্যাদিও পড়ছে এবং যা "ISI Standard" এর মান দ্বারা নির্ধারিত হওয়ার পর বাজারে বিক্রি করা যাবে। উক্ত দু'টি আইনে, ওষুধ বা 'ড্রাগ' বলতে বোঝানো হয়েছে, মানব শরীরে যা কাজ করে বলে দাবি করা হবে যেমন তাবিজ-কবজ, মাদুলি, যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি অনেক কিছুই যা কিন্তু ড্রাগের সংজ্ঞায় পড়ছে।

The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954 আইনের প্রথম সংশোধন হয় ১৯৬৩ তে। এই আইনে 9(A) ধারা সংযোজন করে বলা হয়েছে, এই আইন ভঙ্গকারীদের 'Cognizable Offence'

হিসেবে গন্য করা হবে। অর্থাৎ কেউ পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের না করলেও পুলিশ কোনও ভাবে এই অপরাধ সংগঠিত হয়েছে বলে প্রাথমিক জানার ভিত্তিতে কোনও অভিযুক্তকে Warrant ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারে (Notwithstanding anything contained in The Code of Criminal Procedure 1898 an Offence Punishable under this Act shall be Cognizable)।

আগে Drugs and Magic Remedies Act ভঙ্গকারীদের অপরাধ ছিলো 'Non-Cognizable' অর্থাৎ এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে হত। পুলিশ সরকারের তরফ থেকে অভিযোগকারীর পক্ষে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করতেন। আদালত অভিযুক্তর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বা ওয়ারেন্ট দায়ের করলে তবেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারতেন। এই উল্লিখিত আইন ভাঙ্গাটা যেহেতু Non-Cognizable অপরাধ বলে 1963 সালে আইন সংযোজনের আগে পর্যন্ত গণ্য করা হত, তাই আদালত অভিযুক্তের বাসস্থল কিংবা ব্যবসা কিংবা চাকরিস্থলে থানা মারফত অভিযুক্তকে সমন পাঠাতেন। সমন অর্থাৎ আদালতের নির্দেশ। যাতে লেখা থাকে কবে, কখন, কোন আদালতে হাজিরা দিতে হবে। যেহেতু উল্লেখিত এই আইন ভাঙ্গাটা Criminal Offence বা ফৌজদারি অপরাধ তাই অভিযুক্তকে আদালতে হাজির হয়ে জামিন নিতে হত।

কোনও জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, ওঝা, জানগুরু ইত্যাদি বুজরুক প্রতারকের বিরুদ্ধে Magic Remedies আইন ভেঙ্গেছে বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করার পরও কোনওও বিশেষ কারণে পুলিশ নিরব দর্শক থাকতেই পারেন। তখন আপনি অভিযোগকারী হলেও পুলিশের কাছে অভিযোগ করার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে (যেমন ডাইরি নং অথবা লিখিত অভিযোগ গ্রহণের থানার সিলমোহর ও স্বাক্ষর করা অভিযোগপত্র) আদালতে মামলা করা যায়। একে 'Complain Case' বলে। এই মামলার ভিত্তিতে আদালত সামনস্ পাঠাবেন অভিযুক্তর কাছে। অভিযুক্ত আদালতে হাজির হয়ে জামিন নেবেন। সমন অগ্রাহ্য করলে আদালত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশকে আদেশ দেবে।

এত দূর পড়ে প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা সাময়িক বিভ্রান্ত হতে পারেন। তারা মনে করতে পারেন উক্ত ড্রাগ আইন শুধু তাদের বিরুদ্ধে যারা মন্ত্রতন্ত্র, তাবিজ-কবজ ইত্যাদি কিংবা অলৌকিক উপায়ে রোগ সারানোর দাবী জানাবে অথবা যে ব্যক্তি রোগ মুক্ত করবার প্রতিশ্রুতি দেবে। যদিও বিষয়টি ঠিক তেমন নয়। এখানে একটি বিশেষ খবর তুলে ধরছি যা ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে "এই সময়" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনাম - "বিজ্ঞাপনী-চমকে ঠকে লাইন ডাক্তারের চেম্বার, আদালতে"। -- "টিভির পর্দায় বীরেন্দ্র সহবাগ, হর্ষ ভোগলেদের দেখে আশা জেগেছিল মনে। টাকে চুল গজানোর

বিজ্ঞাপনে মজে অনেক টাকা খরচ করেছিলেন কড়েয়ার যুবক। কিন্তু চুল গজানোর বদলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হন তিনি। সংশ্লিষ্ট সংস্থায় অভিযোগ জানাতে গেলে আমলই দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে ক্রেতাসুরক্ষা আদালতের দ্বারস্থ হন ওই যুবক। আলাদত ওই সংস্থাকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করে ভুক্তভোগীকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন স্থূলতা কমানোর বিজ্ঞাপনে ভরসা করে বোকা বনে যাওয়া হুগলির মধ্যবয়সীও। ভুঁড়ি কমিয়ে রোগা হতে গিয়ে বিপত্তি বেধেছিল। বেহালার গৃহবধূ অবশ্য বিজ্ঞাপনী ওষুধে স্তন ক্যান্সার নিরাময়ের স্বপ্ন দেখে জীবনটাই হারিয়ে ফেলেন। আবার বেলঘরিয়ার এক তরুণ প্রাণে বাঁচলেও মুখমণ্ডলের পোড়া ত্বকের চিকিৎসা করাতে গিয়ে অবসাদের শিকার হন। ফর্সা হওয়ার ক্রিম লাগিয়ে তাঁর শ্যামলা মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। এমন ভুক্তভোগী কম নয়। বিজ্ঞাপনী চমকে আস্থা রেখে পস্তানোর নজির অসংখ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপনের দাবি বাস্তবে মেলে না। উল্টে বিজ্ঞাপনে মজে নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের বড়ি খেয়ে কিংবা তেল বা ক্রিম মেখে হরেক শারীরিক সমস্যার শিকার হন অনেকেই। সে সব সঙ্কট সামলাতে হয় চিকিৎসকদেরই। অনেক মামলাও হচ্ছে ক্রেতাসুরক্ষা আদালতে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের আক্ষেপ, মানুষের হুঁশ ফিরছে না। স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, সে জন্যই চটকদার ও বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনী চমকে রাশ টানতে আইন সংশোধন করতে চলেছে কেন্দ্র। ১৯৫৪-র ড্রাগস অ্যান্ড

ম্যাজিক রেমিডিজ (অবজেকশনেবল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট) আইন কড়া করতে সংশোধনী বিলের খসড়া তৈরি করেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। তাতে বলা হয়েছে, চুল পড়া, চুল পাকা, ফর্সা হওয়া, ক্যান্সার নিরাময়, প্রেশার-সুগার কমানো, লম্বা হওয়া, রোগা হওয়া, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি, স্তন ও লিঙ্গবর্ধনের দাবি বা অর্শ, ফিসচুলা, ক্লান্তি, দুর্বলতা, যৌনসমস্যা, শীঘ্রপতন, বুড়িয়ে যাওয়া, দাঁত শিরশিরানি ইত্যাদি নিরসনের দাবি করে বিজ্ঞাপন চলবে না। আইন ভাঙলে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার সংস্থানও রাখা হয়েছে সংশোধনী বিলে।"

আরেকটি খবরের অংশ তুলে ধরলাম, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০- "এই সময়" পত্রিকা থেকে-

"অমুক তেলে টাকে চুল গজায়! তমুক বড়িতে দূর হয় ক্লান্তি, বাড়ে যৌনশক্তি! এই তেলের ব্যবহারে লিঙ্গবর্ধন অনিবার্য! ওই হেলথ ড্রিঙ্কে লম্বা হওয়া অবশ্যম্ভাবী! অমুক টনিকে স্মৃতিশক্তি ক্ষুরধার হবে! তমুক ক্রিম ব্যবহারে ফর্সা হবে গায়ের রং! হরেক পণ্যের এ সব চটকদার প্রচার তো ছিলই। বিজ্ঞাপনী বাজারে এর সঙ্গে ইদানীং যোগ হয়েছে এমন সব দাওয়াই, যা নাকি ম্যাজিকের মতো নিরাময় ঘটায় ডায়াবিটিস, আর্থ্রাইটিস, এমনকী ক্যান্সারের। এই সব পণ্যের যাবতীয় বিজ্ঞাপনে এ বার কঠোর ভাবে রাশ টানতে উদ্যোগী হল কেন্দ্র। এমন অবাস্তব ও মনভোলানো বিজ্ঞাপনী চমকের

রমরমা বন্ধে আইন সংশোধন করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। পুরোনো আইনে শাস্তির সংস্থান ছিল নখদন্তহীন। তা বাড়িয়ে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড ও ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১৯৫৪-র ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিজ (অবজেকশনেবল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) আইনকে কড়া করতে সম্প্রতি সংশোধনী খসড়া বিল তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। ২০২০-র সেই প্রস্তাবিত বিলের খসড়া নিজেদের ওয়েবসাইটে দিয়ে দেশবাসীর কাছে মন্ত্রক পরামর্শ বা আপত্তির কথা জানতে চেয়েছে আগামী ১৯ মার্চের মধ্যে। খসড়ায় বলা হয়েছে --- ৭৮ রকমের অসুখ বা সমস্যা (আগে ছিল ৫৪টি) নিরাময়ে বিভ্রান্তিকর এই সব মনমোহিনী বিজ্ঞাপন কোনও গণমাধ্যমে দেওয়া যাবে না। বর্তমান সংস্থানে প্রথম দু’বার আইন লঙ্ঘনের শাস্তি যথাক্রমে ছ’ মাস ও এক বছরের জেল। জরিমানার কোনও অঙ্ক বলা নেই সেখানে। প্রস্তাবিত সংশোধনীর খসড়ায় আইন লঙ্ঘনের শাস্তি প্রথম বার দু’ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা। পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।... কেন্দ্রীয় এক স্বাস্থ্যকর্তার কথায়, ‘বর্তমান আইনে যে সব ওষুধের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, তার অনেকগুলিই এখন অচল। আবার অনেক আয়ুর্বেদ-ইউনানি ওষুধ বর্তমান আইনের আওতায় নেই। এই সব ফাঁক গলে বহু পণ্যের বিজ্ঞাপনী চমক বেড়ে গিয়েছে। অথচ তার সঙ্গে বাস্তব সমস্যা সমাধানের সম্পর্ক কম।’ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, গত দেড় বছরে এমন বহু

পণ্য ও ওষুধের অবাস্তব বিজ্ঞাপন এবং তার কুফল সংক্রান্ত হাজারখানেক অভিযোগ জমা পড়েছে সরকারের কাছে। এর মধ্যে কেরালা ও তামিলনাড়ুতে দু'টি মৃত্যুর নজিরও রয়েছে। বছর দেড়েক আগে রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ যেসোনায়েকও জানান, 'গ্রিভান্স এগেনস্ট মিসলিডিং অ্যাডভারটাইজমেন্ট' পোর্টালে ওই অভিযোগগুলি দায়ের হয়েছে এবং এ ব্যাপারে কড়া অবস্থান নিতে কেন্দ্র বদ্ধপরিকর। এর পরেই কয়েকটি অ্যালোপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ-ইউনানি ওষুধের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হয়।

বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এই আইনের প্রয়োগ নিয়ে সন্দিহান। ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক শান্তনু ত্রিপাঠী বলেন, 'আইন কড়া করা হচ্ছে, খুব ভালো কথা। কিন্তু বর্তমান নিরীহ আইনটিও কি কখনও কড়া হাতে প্রয়োগ করা হয়েছে? ৫৪টি অসুখ বা সমস্যার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বিজ্ঞাপনী প্রচারের জন্য কবে কে শাস্তি পেয়েছে যে নয়া আইন সম্পর্কে এত আশাবাদী হব?"

আশাকরি, প্রিয় পাঠক বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন, The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act 1954 এবং The Drugs and Cosmetics Act 1940 আইনানুযায়ী, টাকে চুল গজানো

কিংবা ফর্সা হওয়ার ক্রিম অথবা যৌন সমস্যা মেটানোর হিজিবিজি বিজ্ঞাপনও ড্রাগস আইনে নিষিদ্ধ এবং বে-আইনি।

এই ড্রাগস ও ম্যাজিক রেমেডি আইন নিয়ে একজন স্বঘোষিত যুক্তিবাদী মানুষ নিজের অখণ্ড জ্ঞান জাহির করেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এটা ২০২০ সালের ঘটনা। কোটিপতি ও কুখ্যাত রাজজ্যোতিষী অনিমেষ শাস্ত্রীর "জ্যোতিষ শাস্ত্র বিজ্ঞান" এইধরনের কুযুক্তি ও তার লোকঠকানো জ্যোতিষ বিদ্যার প্রতারণার বিরুদ্ধে লড়াই করবার সময় "ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি"র সহযোদ্ধা, অনির্বাণ পাল একটি পোস্টার বানায় যেখানে লেখা ছিল- "The Drugs & Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act 1954 এবং The Drugs & Cosmetics Act 1940 অনুসারে জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার দাবি বেআইনি।"

এমতাবস্থায় সেই যুক্তিবাদী মশাই মাঠে নামলেন এটা প্রমাণ করতে যে এসকল আইনে রোগ সারাবার দাবি করা হলে তবেই তা আইনবিরুদ্ধ হবে কিন্তু পরীক্ষায় পাশ, মামলায় জেতা, শত্রু বিনাশ এসব তথাকথিত অলৌকিক দাবি করলে কিছুই করা সম্ভব নয়। আসল কথায় বলে, দারোগার চেয়ে চৌকিদারের হাঁক বেশি হয়। সেই যুক্তিবাদী মশাইয়ের এক স্যাঙাত বাবু আরও একধাপ এগিয়ে বললেন, এইসব আইনে

সরাসরি কোথাও নেই যে জ্যোতিষের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান আইনবিরোধী।

সত্যিই কী তাই? এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে, জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপন এবং আইনের দিকেই চোখ দেওয়া যাক। পত্রপত্রিকায় সাড়া ফেলে দেওয়া নামীদামী কিছু জ্যোতিষীরা (যারা আবার তান্ত্রিকও হয়ে গেছে) সকল সমস্যা সমাধানের গ্যারান্টি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয় যা দেখে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত জনগণ এদের কাছে ছোটেন। তারপরে এই প্রতারকেরা পাঁচশো থেকে পাঁচ লাখ যা খুশি নেয় হিজিবিজি তাবিজ-কবজ, রত্নপাথর ইত্যাদির বিনিময়ে। এদের প্রতারকদের সবার ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে তাদের বহু দাবির মধ্যে রোগ নিরাময় এবং অন্যান্য অলৌকিক দাবি আছে। অর্থাৎ, প্রশাসন চাইলেই উপরোক্ত ড্রাগস আইনানুসারে ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু সেই যুক্তিবাদী মশাইয়ের এসব জানা সত্ত্বেও কূটতর্কে প্রবৃত্ত হলেন।

এবার ড্রাগস আইন নিয়ে আর একটু আলোচনায় গিয়ে দেখা যাক কেউ যদি রোগ সারাবার দাবি ছাড়াও অন্যান্য অলৌকিক দাবি করে তাদের উপরোক্ত আইনানুসারে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কিনা।

Drugs & Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act no.21, 1954 এর মূল সংজ্ঞা বা

Long Title অংশে আছে "An act to control the advertisement of drugs in certain cases, to prohibit the advertisement for certain purposes of remedies alleged to possess magic qualities and to provide for matters connected therewith."

এখানে 'certain cases', 'to provide for matters connected therewith' শব্দবন্ধের দিকে প্রিয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যখন কোনও আইনের প্রয়োগবিধি নিয়ে আলোচনা করা হয় তখন প্রতিটি শব্দ এবং তার ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে আইনবিদদের ভিতর চুলচেরা বিশ্লেষণ, বাদানুবাদ হয়ে থাকে। উপরোক্ত সংজ্ঞার বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়, "অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ওষুধ প্রয়োগে সমস্যা সমাধান এবং সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনকে প্রতিহত করার জন্য এই আইনের উপস্থাপনা করা হয়েছে"।

আইনে যদি শুধুমাত্র রোগ নিরাময়ের বিজ্ঞাপন প্রতিহত করার কথা থাকত তাহলে 'certain cases' না লিখে সরাসরি 'certain diseases' লেখা হত, আর 'connected therewith' অংশটা দিয়ে সামগ্রিক সবকিছুকেই জড়িয়ে নেওয়া হত না।

আইনটা আরও বিস্তারিত পড়লেই বোঝা যাবে এই আইনের প্রকৃতি হচ্ছে 'inclusive'। সরাসরি লেখা সম্ভব হয়নি এমন কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়েও আইনের প্রয়োগের জন্য সংজ্ঞার শুরুতে বিভিন্ন স্থানেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে, "In this Act, unless the context otherwise requires,-"
অর্থাৎ, "আইনানুসারে, যদি না অন্যভাবে প্রয়োজন হয়"। আইনে 'ড্রাগ' বা 'ওষুধে'এবং 'ম্যাজিক রেমেডিজে'র সংজ্ঞায় কিন্তু শুধুমাত্র পরিচিত ওষুধের নাম করা হয়নি। খুব স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে তাবিজ, কবচ, মাদুলি, তন্ত্রমন্ত্র, জড়িবুটি এবং অলৌকিক সমস্যা সমাধানের দাবি করা যে কোনও প্রকারের জৈব এবং অজৈব পদার্থকেই গণ্য করা হবে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি তন্ত্রমন্ত্র, তাবিজ-কবচ, রত্ন ইত্যাদির সাহায্যে রোগ সারাবার দাবি করে তবে তা দণ্ডনীয় অপরাধ। যুক্তিবাদী মশাইয়ের স্যাঙাৎ বাবু অবশ্য বোঝাতে চেয়েছেন জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু বলা নেই। কিন্তু উনি বুঝলেনই না, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক ইত্যাদিরাও আইনের চোখে 'ব্যক্তি' হিসাবেই গণ্য হয়।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, সরাসরি রোগ সারাবার দাবি ছাড়া এরা আর যেসব দাবি করে তার অন্যতম হল বশীকরণ। বশীকরণ মানে হল তাবিজ-কবচ ইত্যাদির সাহায্যে অন্যের মস্তিষ্কের উপর নিয়ন্ত্রণ। সোজা ভাষায়, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্নায়ুকোষের উপর নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব বিস্তার। উপরোক্ত আইনের ২ (বি),

(সি) ধারা অনুযায়ী কিন্তু মানুষ এবং অন্য প্রাণীর শরীরের আনবিক স্তরেও বা অন্য কোনভাবে প্রভাব বিস্তার পর্যন্ত আইনত নিষিদ্ধ। একইভাবে শত্রু দমনকে যদি খুন নাও ধরি, শত্রু বশীকরণ কিন্তু মনে করতেই পারি।

রত্ন ধারণ করিয়ে পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করাবে বলেছে? জ্যোতিষীরা রত্নের সুফলের সাধারণত যে বৈজ্ঞানিক (!!) ব্যাখ্যা দেয় তা হল সূর্যের রশ্মির সাতটা রঙ যাকে নাকি কসমিক রে বলে, সেটা রত্নের মাধ্যমে শোষিত হয়ে শরীর তথা মস্তিষ্কের উন্নতি সাধন করে। এটা যে অবাস্তব সে ব্যাখ্যা নাহয় বাদ থাক। কিন্তু এটাও যে আইনের আওতায় পড়ছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।



তারপর ধরুন, বিজ্ঞাপনে স্বামী বা স্ত্রী অন্যের প্রতি আকর্ষণ হারাচ্ছেন, দাম্পত্যসুখ পাচ্ছেন না বলে থাকে। এই কথায়

প্রচ্ছন্নভাবে বশীকরণ বা যৌনসুখ ফিরিয়ে আনার কথা কি বলা নেই?

সোজা ভাষায়, যে সকল দাবি এসব মহাশয়েরা করে থাকেন সেগুলো কিন্তু আইনের আওতায়ই পড়ে। এদের কারণে কেউ মারা গেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। এর জন্য সরাসরি জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, ওঝা, গুনীন, পীর, ফকির আইনে এসব আলাদাভাবে বলে দেওয়ার দরকার হয় না।

আগেই উল্লেখ করেছি, ১৯৬৩ সালে বিজ্ঞাপন বিরোধী আইনকে 'cognizable' করা হয়েছে। অর্থাৎ পুলিশ প্রশাসন কোন অভিযোগ ছাড়াই স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ব্যবস্থা নিতে পারে। তাছাড়া যখনই এসব কেসে পুলিশ গ্রেফতার করে তখন কিন্তু প্রতারণা, জালিয়াতির ধারাগুলোও (রত্ন, যন্ত্রম এসব দিয়ে মামলা জেতানো ঢুকে গেল) প্রয়োগ করে। অলৌকিক বিজ্ঞাপন বিরোধী আইনের ১৩ নম্বর ধারাতেও কিন্তু বলা আছে এর সাথে যদি অন্য কোনও ধারা উপযুক্ত হয় সেগুলোও একইসাথে প্রয়োগ করা হবে।

আলোচনার সূত্রে এটাও জানিয়ে রাখি, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ সংগঠনের তরফে সৌরভ চক্রবর্তী, জ্যোতিষ এবং বিভিন্ন ধরনের বশীকরণ সংক্রান্ত এবং যাদু চিকিৎসা বা ম্যাজিক রেমিডি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলি সংবিধানের ৫১ এ(এইচ) ধারার পরিপন্থী হওয়ায় সেগুলিতে লাগাম টানার জন্য কেবল

টেলিভিশন নেটওয়ার্ক রেগুলেশন আইন এবং কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞাপন ও অনুষ্ঠান সূচক(code) অনুসারে বিজ্ঞাপনগুলির নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করার জন্য বিজ্ঞান মনস্কতা ও যুক্তিবাদকে সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলবৎ করবার জন্য এ রাজ্যে কুসংস্কার বিরোধী আইনের অভাব থাকায় যতদিন না বিধানসভায় এই মর্মে আইন পাশ হয় ততদিন পর্যন্ত আদালত যাতে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা (guideline) তৈরি করেন তা নিশ্চিত করার জন্য কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে যে জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করেছিলেন তার শুনানির দিন ছিল গত ৮ এপ্রিল ২০২২।

এই শুনানিতে বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষে আইনজীবী সব্যসাচী চ্যাটার্জী, মূল মামলার যুক্তিগুলি ব্যাখ্যা করেন। আদালত রাজ্যের ও কেন্দ্রের সরকার ছাড়াও এই মামলায় এ্যাডভার্টাইজমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অব ইন্ডিয়ার অনুপস্থিতিতে এই মামলাটির শুনানির একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য্য করেন। এর আগে এই মামলাটি চলাকালীণ অবস্থায় মহামান্য বিচারপতি শ্রী সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল যে দেশের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলকে এই মামলায় উপস্থিত থাকতে হবে।

সেদিন, মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রী প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও মহামান্য বিচারপতি শ্রী রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ এই

মামলাটিতে বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রক সংস্থা এ্যাডভার্টাইজমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অব ইন্ডিয়াকে নোটিশ জারি করবার নির্দেশ দিয়েছেন। ৪ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য হয়েছিল। সর্বশেষ তথ্য এখনও এই লেখকের অজানা বলে জানাতে পারলাম না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা। আপনি যদি পশ্চিমবঙ্গবাসী হন এবং আপনার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ থাকে কোনও বুজরুক, প্রতারকের বিরুদ্ধে তাহলে আপনি আপনার অভিযোগ জানাবেন এই ঠিকানায়- The Director, The Directorate of Drugs Control, Government of West Bengal, P-16, India Exchange Place Extension, K.I.T. Building, 5th Floor, Kolkata-700073.

অভিযোগ দায়ের করার সময় স্মরণে রাখবেন, রোগ সারাবার কোনও বিজ্ঞাপন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলে তার জেরক্স কপি অভিযোগপত্রের সাথে যুক্ত করে দেবেন এবং মূল পত্রিকাটি যত্ন করে রেখে দেবেন যা মামলা চলাকালীন কাজে লাগবে। আপনার অভিযোগ পাওয়ার পর ড্রাগস কন্ট্রোল থেকে অভিযুক্তের কাছে জানতে চাইবে এই ধরনের তাবিজ কবচ ইত্যাদি (যা আইনের সংজ্ঞায় ওষুধ বা ড্রাগ) তৈরির বৈধ লাইসেন্স তার কাছে আছে কিনা? ড্রাগস কন্ট্রোলের দেওয়া লাইসেন্সগ ছাড়া ওষুধ বানানো বা বিক্রির জন্য জ্যোতিষী-তান্ত্রিক ইত্যাদিদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে

অভিযোগ দায়ের করবে ড্রাগস কন্ট্রোল। মামলাটি হবে অভিযুক্ত ব্যক্তি বনাম সরকার। আপনাকে বড়জোর সাক্ষী দেওয়া ছাড়া কিচ্ছুটি করতে হবে না। এবারে দু'টি খবর জানিয়ে লেখাটির পরিসমাপ্তি ঘটাবো।

উত্তরাখণ্ডে রামদেব বাবার পতঞ্জলির ওষুধের রমরমা ব্যবসা। দেরাদুনের দিব্যা ফার্মেসি পতঞ্জলির পক্ষে এই সব আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি করে। এই রকম পাঁচটি ওষুধ হোল মধুগৃত, আইগৃত, থাইরোগৃত, বিপিগৃত ও লিপিডম। প্রস্তুতকারকদের পক্ষ থেকে এই সব ওষুধের উপাদান, ফর্মুলা ও গুনাগুন ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞাপনের মাধমে প্রচার করা হোত যে এই ওষুধগুলি ডায়াবেটিস, গ্লুকোমা, গয়টার, উচ্চ রক্তচাপ এবং উচ্চ কোলেস্টেরল রোগীর পক্ষে উপকারী।

কেরালার জনৈক ডাঃ কে ভি বাবু এই বিজ্ঞাপনগুলির বিরুদ্ধে উত্তরাখন্ডের স্বাস্থ্য নিয়ামক সংস্থার কাছে অভিযোগ করেন। অভিযোগে বলা হয় যে, এই বিজ্ঞাপন বিভ্রান্তিকর শুধু নয় এটা ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট, ১৯৪০ এবং ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট, ১৯৫৪ এর বিরোধী। সাধারণ মানুষ এ জাতীয় বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হচ্ছেন।

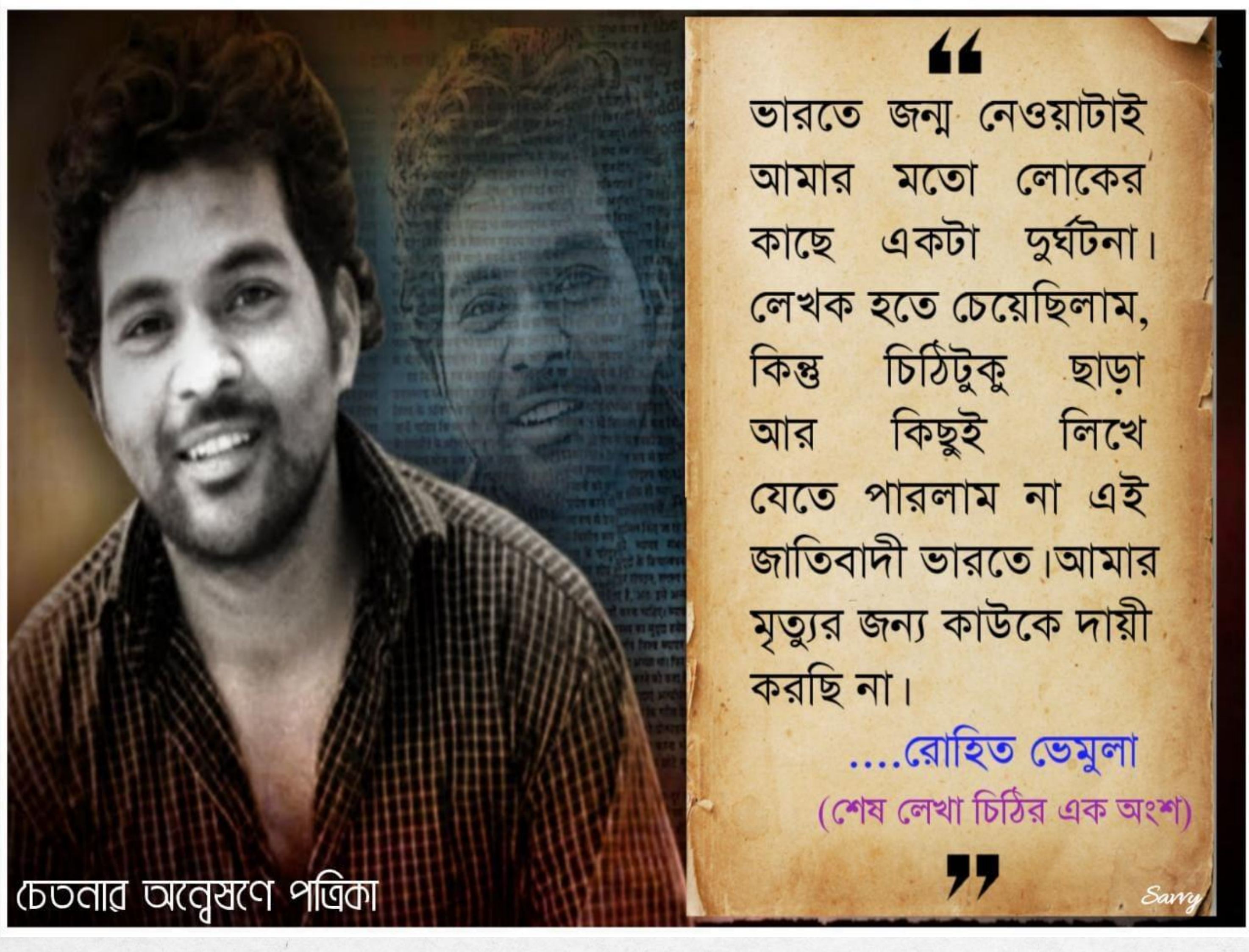
অভিযোগের সত্যতা অনুসন্ধানের পর উত্তরাখন্ড আয়ুর্বেদ ও ইউনানি লাইসেন্স অথরিটি, বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের দায়ে,

দিব্যা ফার্মেসিকে এই সব ওষুধ বন্ধের নির্দেশ দেয় (সূত্র- দি টেলিগ্রাফ / ১০.১১.২০২২। লিংক - https://www.telegraphindia.com/india/uttarakhand-bars-production-of-5-ramdev-medicines/cid/1897224)।

এই খবরের আরেকটি বিশেষ খবর - রামদেবের দিব্য ফার্মেসির উৎপাদিত পাঁচটি ওষুধের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিল উত্তরাখণ্ডের আয়ুর্বেদ ও ইউনানি লাইসেন্সিং অথরিটি। আগের নির্দেশিকাকে সংশোধন করে শনিবার নতুন নির্দেশিকা জারি হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ওই ৫টি ওষুধ উৎপাদন জারি রাখতে পারবে রামদেবের সংস্থা (সূত্র- আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন, ১৩/১১/২০২২। লিংক- https://www.anandabazar.com/india/ban-on-ramdevs-5-products-revoked-by-uttarakhand-govt-dgtl/cid/1384018)।

এতকিছুর পরেও কিন্তু বলব, এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী ও স্পষ্ট আইন দরকার। বিশেষত বিজ্ঞাপন বিরোধী আইনের তো ব্যাপক সংশোধন প্রয়োজন। কিন্তু আইন থাকলেই কিছু হয় না। ভারতে শাসকের স্বার্থে বহু উপযোগী আইন শুধুই মলাটবন্দি হয়ে পড়ে থেকে শুধুই ধুলোই জমে। তাছাড়া, প্রচুর সম্পদের চূড়ায় বসে থাকা প্রতারকেরা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি নিজেদের প্রতারণা

চালিয়ে যায়। উদাহরণ, রামদেবের পতঞ্জলি ওষুধের ঘটনাটি। কিন্তু পুলিশ, প্রশাসন চাইলেও ড্রাগস ও ম্যাজিক রেমেডিস ভঙ্গকারীদের শুধুমাত্র আইনের অভাবে গ্রেফতার করতে পারবে না সেটি ডাহা মিথ্যে। প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা, যা অনেকেরই নেই।



সূচিপত্র

প্রসঙ্গ: প্রেম

লি খে ছে ন- রা জু দ ত্ত



প্রেম হল একটা অনুভূতি, যা দুটি মানুষের পরস্পরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থেকে জন্মলাভ করে। এই আকর্ষণ হতে পারে শারীরিক বা চারিত্রিক। অর্থাৎ কেউ কারো শারীরিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়ে, কেউ প্রেমে পড়ে কারো চারিত্রিক গুনাবলীর মুগ্ধতায়। 'ভালো লাগা' জন্ম দেয় 'প্রেম' নামক অনুভূতির যা ক্রমশ ভালোবাসায় পরিণত হয়।

সংকীর্ণ অর্থে আমরা 'প্রেম' বলতে বুঝি 'নারী ও পুরুষের এমন এক পারস্পরিক সম্পর্ক যাতে মিশে থাকে যৌনতা'। নারী পুরুষ উভয়ের যৌন আকাঙ্খা চরিতার্থ করতে উভয়ই

শারীরিকভাবে মিলিত হয় 'যৌন সঙ্গম' ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ব্যাপক অর্থে 'প্রেম' হল সেই অনুভূতি যা থাকে সকল মানুষের প্রতি সকল জীবের প্রতি। যাতে থাকে না কোনও যৌনতার প্রশ্ন। থাকে না কোনও সীমাবদ্ধতা। অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে 'প্রেম' বিশ্বজনীন'।

আমাদের দেশে নারী পুরুষের যৌন আকাঙ্খা চরিতার্থ করার সাথে 'বিবাহ' নামক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যের প্রশ্নটি জড়িত। শারীরিক সম্পর্ক তো দূরের কথা, 'বিবাহের পূর্বে' নারী পুরুষের পারস্পরিক 'চুম্বন', 'আলিঙ্গন' এর মতো আচরণগুলিও 'সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। অথচ প্রাকৃতিকভাবে নারী পুরুষ উভয়েরই যৌন মিলনের আকাঙ্খা থাকাটাই স্বাভাবিক। অথচ বিবাহ না করলে এই আকাঙ্খা পূরণ 'সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। অথচ দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ, যারা 'প্রেম' এর সম্পর্কে সম্পর্কিত তাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে শারীরিকভাবে মিলিত হওয়া অনৈতিক বলে আমি মনে করি না। এটা আইনত 'অপরাধ' বলেও আমার জানা নেই। তবুও রক্ষণশীল সমাজ নারী পুরুষের যৌন মিলনের আচরণটিকে 'বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। আশ্চর্য!

তাহলে 'বিবাহ' করে নিলেই তো হয়! সেখানেই তো সমস্যা। 'বিবাহ' করতে হলে আপনাকে হাজার একটা শর্ত পূরণ করতে হবে। এই যেমন আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, জাত, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র

এরকম হাজারো পরিচয় যদি সমাজসম্মত ও বিবাহে উদ্যোগী দুটি মানুষের উভয়ের পরিবারসম্মত হয়, তবেই আপনি বিবাহের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন।

মেয়েদের ক্ষেত্রে 'শারীরিক সৌন্দর্য্য' ও ছেলেদের ক্ষেত্রে 'চাকরিজীবি' হওয়া প্রায় বাধ্যতামূলক। তার ওপর তো উভয়ের পৈতৃক ও নিজ অর্জিত সম্পত্তি থাকাও প্রয়োজন। মেয়ের বাবার তো প্রচুর টাকা পয়সা থাকা দরকার না হলে 'পণ' বাবদ খাট, বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, টিভি, ফ্রিজ, আলমারী, বাইক ও মেয়ের জন্য সামান্য কয়েক ভরি গহনা কিনবেন কোথা থেকে? এগুলো না দিলে সমাজ যে মেনে নেবে না। মেনে নেবে না মেয়ে জামাই ও তার পরিবার উভয়ই। কাজেই...

এই বিবাহ তিনটি উপায় হয়ে থাকে। এক - নিজেদের পছন্দ মতো 'লাভ ম্যারেজ' এবং দুই- উভয়ের পরিবারের পছন্দমতো 'অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ' ও সর্বসম্মতিক্রমে 'লাভ অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ'। শেষোক্ত উপায়টি প্রায় বিরল ঘটনাগুলির একটি। অপর দুটি পন্থার প্রথমটি প্রায় কারোরই 'পরিবারসম্মত' নয়। যদিও এটিই আমি সমর্থন করি। দ্বিতীয়টি আজকাল প্রায় বিরল পন্থা হতে চলেছে। বর্তমানে এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য 'অনলাইন ঘটক' রূপে বিভিন্ন অ্যাপের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন বেঙ্গলি ম্যাট্রিমনিয়া, শাদি ডট কম।

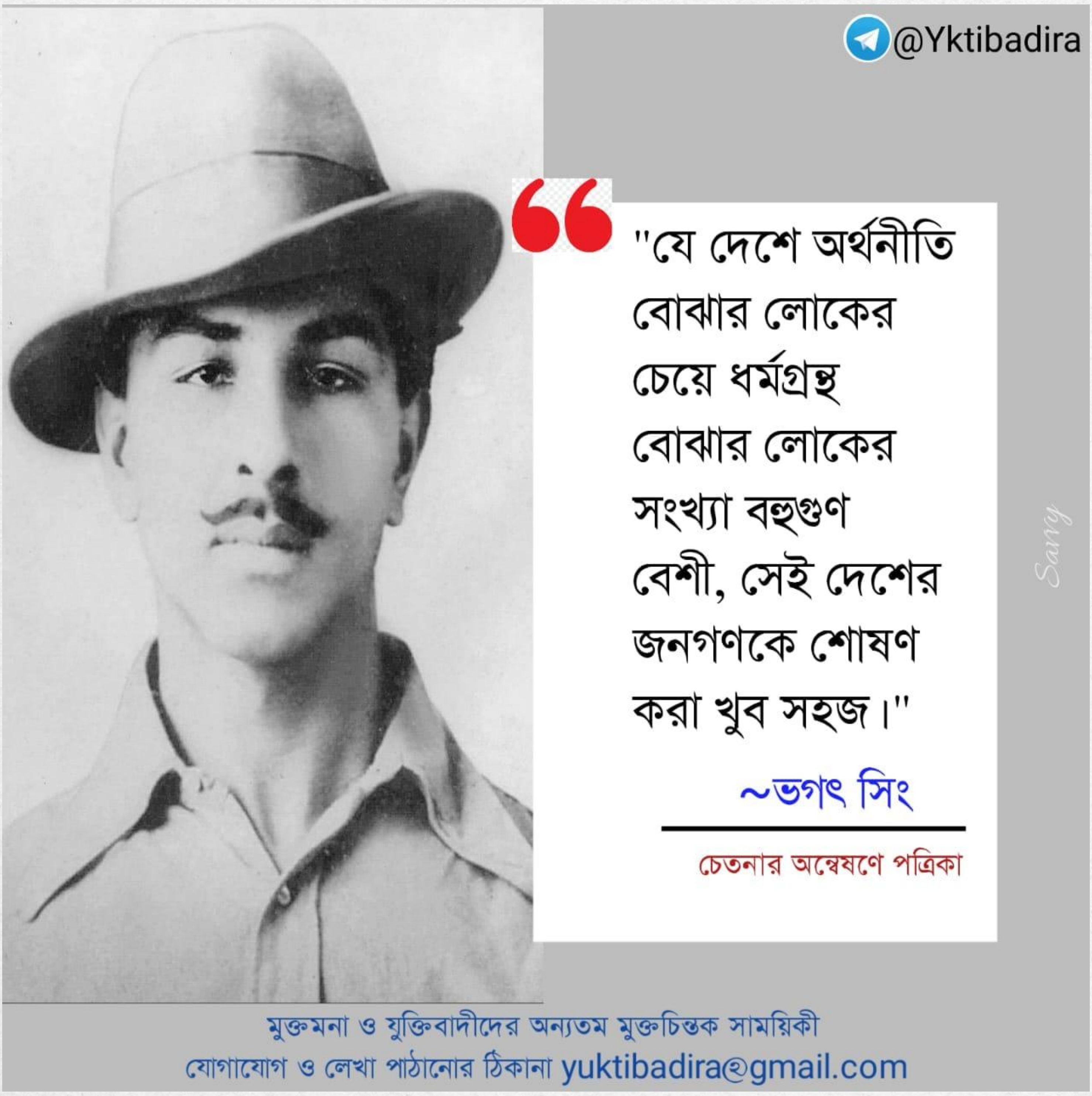
আমার ক্ষুদ্র জীবনের অতি সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, উপরিউক্ত উপায়গুলির মধ্যে বর্তমান প্রজন্মের পছন্দ প্রথম উপায়টি। যেহেতু এই উপায়টি সাধারণত সমাজ ও পরিবার সম্মত নয়, তাই বর্তমানে বাড়ির অমতে (বাড়ি থেকে পালিয়ে) রক্ষণশীল সমাজপতিদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বিবাহ করার ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদ্বেগের বিষয় এই যে, এই সকল বিবাহিত ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নয়। নিজেদের শারীরিক ও মানসিকভাবে গড়ে না তুলে, নিজেরা অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সন্তানাদি 'মানুষ' করার সুকঠিন সংগ্রামে ব্রতী হচ্ছে। যার ফলে গড়ে উঠছে এক যণত্রসুলভ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। যারা সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি অর্জন করতে পারছে না।

আবার যে সকল ছেলেমেয়েরা পরিবার ও সমাজের অমতে লড়াই করে তাদের প্রেমকে পূর্ণতা দিতে, পারছে না বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে, তারা হয়ে যাচ্ছে 'ব্যর্থ প্রেমিক' 'ব্যর্থ প্রেমিকা'। নারী পুরুষের সম্পর্ক মানেই 'প্রেমের সম্পর্ক' এই ভ্রান্ত ধারনার বশবর্তী হয়ে কেউ কেউ জড়িয়ে পড়ছে একাধিক 'প্রেমের সম্পর্কে'। তাদের এই সকল সম্পর্কের ভিত এতটাই দুর্বল যে একাধিক সম্পর্কে জড়ালেও কোনও সম্পর্কই পূর্ণতা লাভ করছে না। 'প্রেম' এর গভীরতা উপলব্ধি করতে না পেরেই তারা নিজেদের 'ব্যর্থ প্রেমিক, ব্যর্থ প্রেমিকা'

মনে করছে। এরপর তারা হয়ে উঠছে 'প্রতিহিংসাপরায়ণ। যার ফল সম্প্রতি আমরা দেখছি একের পর এক 'প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে প্রেমিকাকে খুন' এর মতো ভয়ানক ঘটনায়। সবকিছু 'চাইলেই পাওয়া যায় না, লড়াই করে অর্জন করতে হয় নিজ যোগ্যতায়'। এই শিক্ষা না থাকায় আজকের প্রজন্ম 'প্রত্যাখান' 'ব্যর্থতা' এগুলি মেনে নিতে পারছে না। কখনো হয়ে উঠছে 'আত্মঘাতী' কখনও বা 'ঘাতক'। উভয় ঘটনাই অত্যন্ত উদ্বেগজনক। খুনের ঘটনাও আজকাল প্রতিরোধের চেষ্টা না করে মানুষ তার 'লাইভ ভিডিও ' রেকর্ড করছে। কী অসম্ভব বিকৃতমনস্কতার প্রসার ঘটছে, ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়। 'লাইভ স্যুইসাইড' এর ঘটনাও আজকাল ঘটতে দেখা যায়। মানসিক অবসাদ কোন্ পর্যায় পৌঁছলে এটা করা সম্ভব!

শুধু তাই নয়। আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে 'পরকিয়া' সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা। 'মূলত শারীরিক সুখলাভের আশায় সন্তানের কথা না ভেবে বাবা মায়েরা লিপ্ত হচ্ছে অনৈতিক সম্পর্কে। যার গভীর প্রভাব পড়ছে শিশুকিশোরদের ওপর। এই ঘটনাগুলি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। 'অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্খা' পরকিয়ার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার মূল কারণ হলেও অনেকসময়ই স্বেচ্ছাচারী, বেপরোয়া মানুষ 'লোভ' (অর্থনৈতিক ও শারীরিক) এর বশে এই ধরনের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।

প্রেমহীনতার এক জটিল আবর্তে আমরা ক্রমশ আবদ্ধ হয়ে পড়ছি। যা থেকে বেরোতে না পারলে, চরম সংকটের সম্মুখীন হবে মানব সভ্যতা। নেমে আসবে প্রেমহীনতার এক অপ্রতিরোধ্য মহামারি।



সূচিপত্র

শিশুমন, কুসংস্কার ও অঙ্গীকার

লিখেছেন - তন্ময় দাশগুপ্ত



" যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে টানিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

পঙক্তি দুটি অন্য প্রসঙ্গে লেখা হলেও এই ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হওয়ায় প্রবন্ধটি কবিগুরুর অসাধারণ পঙক্তি দু'টি দিয়ে শুরু করলাম। কুসংস্কার অর্থাৎ অন্ধবিশ্বাস দ্বারা সৃষ্ট পশ্চাৎমুখী মানসিকতা সমাজ সভ্যতার অগ্রগতিতে ব্যাঘাত

ঘটায়, সমাজ সভ্যতার বিকাশ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

কুসংস্কার শব্দটির আভিধানিক অর্থ, "ভ্রান্ত অন্যায় বা কদর্য ধারণা, রীতি অথবা ধর্ম বিশ্বাস।" অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী কুসংস্কারের বর্ণনা হল " প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না এমন শক্তি বা এমন কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস, অজ্ঞতা রহস্যময় কিছুর অযৌক্তিক ভীতি।"

অনেক কুসংস্কার কালের গর্ভে হারিয়ে গেলেও এই একবিংশ শতাব্দীতেও অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস, নানান ধর্মীয় আচার আচরণ পালন, জ্যোতিষ নির্ভরতা, গ্রহের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে রত্ন ধারণ ইত্যাদি মানুষের মধ্যে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। যার ফলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যাক্তি প্রতিটি ঘটনার পেছনে কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণের ভ্রান্তি থেকে মুক্ত না হয়ে সত্যানুসন্ধানের জ্ঞান অর্জনে ভুল পথে পরিচালিত হয়।

জীববিজ্ঞান অনুযায়ী মনুষ্য সন্তানের জন্ম ও বয়সন্ধিক্ষণের মধ্যবর্তী পর্যায়ের রূপ হচ্ছে শিশু। মন হল মানুষের সেই মাধ্যম, যার দ্বারা তার আচরণ (চিন্তন, অনুভূতি এবং ইচ্ছা বা ক্রিয়া) প্রকাশিত হয়। মন মানুষের অভিব্যাক্তি। অর্থাৎ শিশুমন হল শিশুর চিন্তন, অনুভূতি এবং ইচ্ছার প্রকাশ হওয়ার

মাধ্যম। শৈশব থেকেই প্রত্যেকের জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয় তার মন।

প্রাথমিক অবস্থায় শিশুর মনোভাব আনন্দ ও বেদনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ধীরে ধীরে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবেশের সাথে অভিযোজন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি শিশু কতকগুলি স্বতন্ত্র্য আচরণ করার ক্ষমতা অর্জন করে এবং তার ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ শুরু হয়। মনোবিদ সি এইচ জাড এর মতানুসারে "মানুষের আচরণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবসময়েই পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হচ্ছে। যে কোনও রকম আচরণের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনই হল বিকাশ"। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিজীবনের শুধুমাত্র মানসিক বিকাশ নয়, ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ ও পরিপূর্ণ বিকাশে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ পথনির্দেশ। যেহেতু বিকাশ এক ধরণের অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া তাই ভালো বা মন্দ যে কোনও দিকেই সে চালিত হতে পারেন। জন্মমুহূর্ত থেকে কৈশোর, এই সময়ের মধ্যে মানবশিশুর ব্যক্তিত্বের ভিত্তি তৈরি হয়ে যায়। তার উপরেই পরবর্তী ভবিষ্যৎ জীবনের গতিবিধি এবং বিকাশধারার ধরণ নির্ভর করে।

মনোবিদ আলপোর্ট এর বক্তব্য অনুযায়ী "পরিবর্তনশীল সক্রিয় জৈবিক মানসিক সত্তার যে সমন্বয় ব্যাক্তির অভিযোজনমূলক আচরণে তার নিজস্বতা প্রকাশে সহায়তা করে তাই হল ব্যাক্তিসত্তা।" ব্যাক্তিসত্তার বিকাশের প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ব্যাক্তির

মধ্যে স্বল্পহারে কিছু মানসিক সংগঠনের সৃষ্টি হতে থাকে, যার দ্বারা তাদের আচরণ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যাক্তিসত্তার বিকাশ শুরুর পর যখন শিশুর সামাজিক ও নৈতিক বোধ জাগ্রত হয় তখন থেকে চরিত্রগঠন আরম্ভ হয়। অর্থাৎ নৈতিক বা সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারা বিচার্য ব্যাক্তিসত্তাই হল ব্যক্তির চরিত্র। মনোবিদ হারলক তার বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রমাণ করেছেন যে বাল্যকালের বিভিন্ন আচরণ ও অভিজ্ঞতা ব্যাক্তির পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে।

একজন মানুষের ব্যাক্তিত্বর রূপ বিশ্লেষিত হয় সে নিজেকে কীভাবে চারপাশের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্ত করছেন বা কিভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন, তার ওপর ভিত্তি করে। ব্যাক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ শৈশবকালে যদি অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের সচেতন কিংবা অচেতন কারণবশত কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে তবে শিশুটির বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিশেষত পরিবার, শিক্ষাকেন্দ্র, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, কোচিং বা গৃহশিক্ষক প্রভৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং শিক্ষানীতি, পাঠ্যক্রম, মিডিয়া প্রভৃতির পরোক্ষ প্রভাব শিশুমনে প্রতিফলিত হয়। মনে রাখতে হবে কুসংস্কার বিস্তারে রাস্ট্রের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। জয়ফুল হার্ট ফাউন্ডেশনের মতে শিশুর মস্তিস্কের বিকাশ তার পরিবার, যত্নকারী,এবং সমাজের প্রভাবে প্রভাবিত হয়।

সাধারণত পাঁচ বছর বয়স থেকে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে অনেকসময় অনেকে অনুকরণ বা অনুবর্তনের শিকার হয়। বিভিন্ন কুসংস্কারের প্রভাবে অস্থায়ী ঋণাত্মক মনোভাব পরবর্তীকালে স্থায়ী আকার ধারণ করে ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করে। শিশুমনে কুসংস্কারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব তাঁর চারিত্রিক আচার আচরণ গঠনে অর্থাৎ শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। প্রশ্নহীন অর্থাৎ অন্ধভাবে সব কিছুকে মান্যতা দেওয়া হলে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণে অনীহা জন্মালে ছোটবেলা থেকেই গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানোর মানসিকতা তৈরি হয়। হীনমন্যতা, প্রশ্নহীন আনুগত্য, বিচার বিশ্লেষণ না করেই অন্যের কথায় সায় দেওয়া, বা বশ্যতা স্বীকার করা দুর্বল চরিত্রের লক্ষণ। এই মন যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্বল হয়ে আত্মবিশ্বাসের অভাবে স্বীয় ক্ষমতার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, তবে পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। অন্ধবিশ্বাসের পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠার ফলে পরবর্তী প্রজন্ম দূরদর্শিতার অভাবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। কুসংস্কার থেকে উদ্ভূত গোঁড়ামি পদে পদে নানান সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুটির উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্ধকার নামিয়ে আনে। শিশুর প্রতি আধিপত্য বজায় রাখা, তাকে নিজের বিশ্বাস মানতে বাধ্য করা সন্তানের ক্ষতি করে। শিশুমনে মানসিক অবসাদের সৃষ্টি করে।

মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী যেহেতু মানসিক স্থৈর্য, সংকল্প, স্থিরচিত্ত, প্রক্ষোভমূলক আচরণে সাম্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি সুচরিত্রের লক্ষণ, বিপরীতে মানসিক চাপল্য, সংকল্পের অভাব, প্রক্ষোভমূলক আচরণে অসমতা ইত্যাদি দুর্বল চরিত্রের লক্ষণ তাই এইসকল মানসিক সংগঠন প্রতিটি ব্যাক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই মানসিক সংগঠনের ভিন্নতার জন্য আদর্শেরও ভিন্নতা হয়। ব্যাক্তিসত্তা বিকাশের প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার প্রভাব না থাকলে আত্মসচেতনাও অসম্পূর্ণ থাকতে পারে।

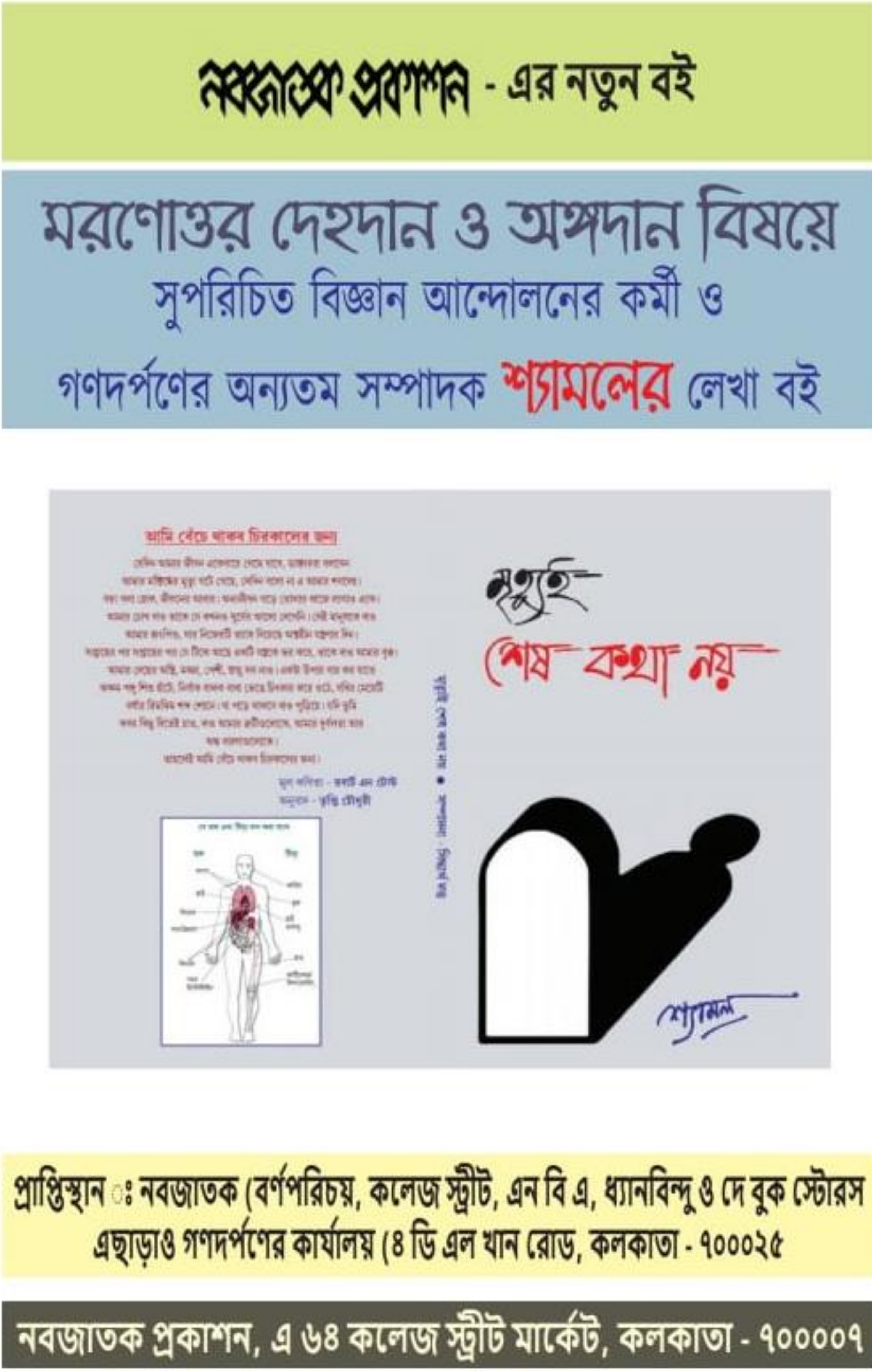
তাই আমাদের সকলের উচিৎ আমাদের দেশের স্বার্থে,মানবসভ্যতার স্বার্থে সু-অভ্যাস ও সু-শিক্ষায় পুষ্ট শিশুমন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ দায়িত্ব পালন করা। কারণ যে কুশিক্ষা উন্নতির পথে অন্তরায় সেই কুশিক্ষায় পুষ্ট মানুষের ভারে জর্জরিত দেশ কোনওদিকেই উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। তাই একটা জাতির বলিষ্ঠ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার সময় যুক্তিনির্ভর ও প্রমাণযোগ্য নির্ভেজাল তথ্য পরিবেশন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব যাতে প্রতিটি শিশু প্রশ্নহীন আনুগত্য থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিটি ঘটনার পশ্চাতে কার্যকারণ সম্পর্ক খোঁজার অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানমনস্ক মন নিয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে।

সংবিধানের ৫১ নং ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে, "ভারতের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হল বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবতাবাদ বিকশিত করা ও অনুসন্ধিৎসু ও সংস্কারমুখী হওয়ার"। তাই আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হওয়া উচিত,সংবিধানে বর্ণিত এই ধারার প্রতি সম্মান জানিয়ে সুস্থ নাগরিক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্রতী হওয়া।

শেষ করি, কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর অসাধারণ দুটি লাইন দিয়ে,

"এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

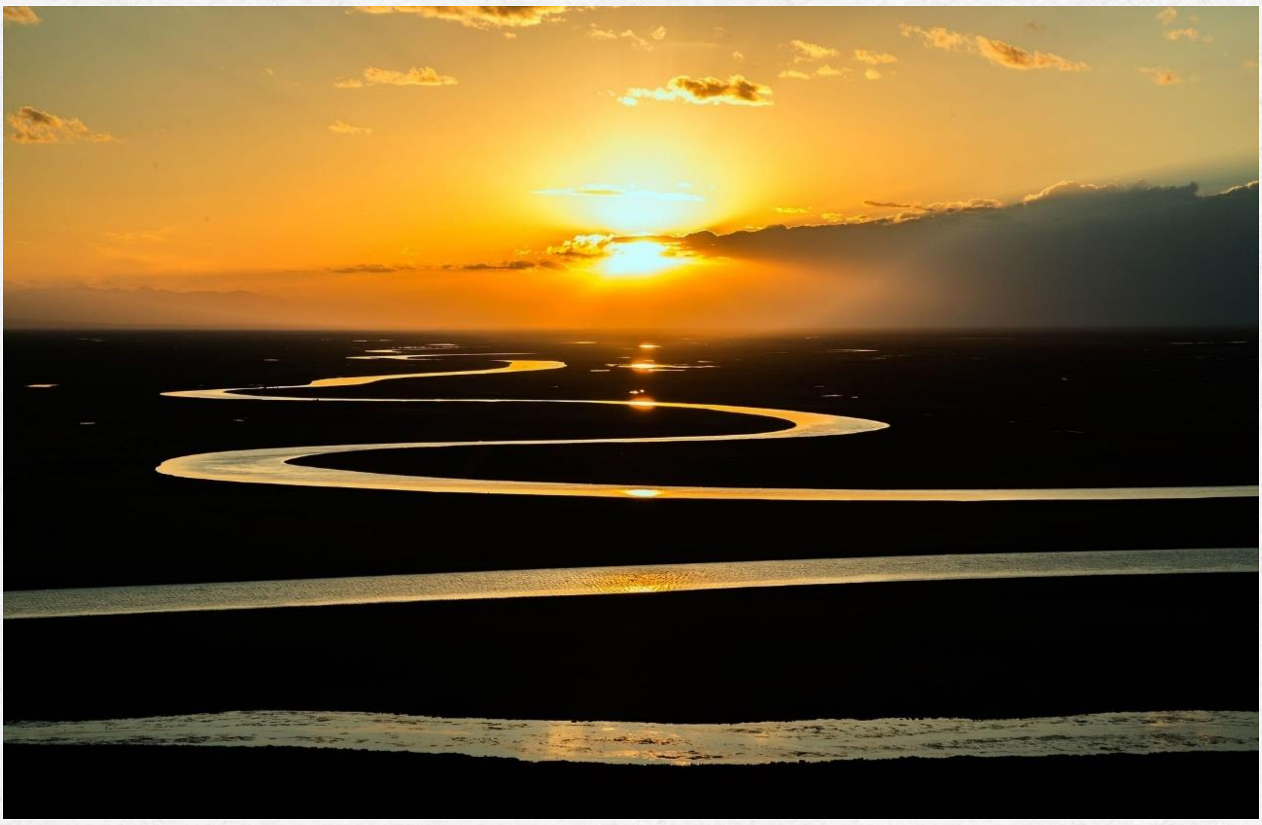
এই অঙ্গীকার হোক আমাদের সকলের।


নবজাতক প্রকাশন - এর নতুন বই
মরণোত্তর দেহদান ও অঙ্গদান বিষয়ে
সুপরিচিত বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী ও
গণদর্পণের অন্যতম সম্পাদক শ্যামলের লেখা বই
আমি বেঁচে থাকব চিরকালের জন্য
মৃত্যুই
শেষ কথা নয়
শ্যামল
প্রাপ্তিস্থান ঃ নবজাতক (বর্ণপরিচয়, কলেজ স্ট্রীট, এন বি এ, ধ্যানবিন্দু ও দে বুক স্টোরস
এছাড়াও গণদর্পণের কার্যালয় (৪ ডি এল খান রোড, কলকাতা - ৭০০০২৫
নবজাতক প্রকাশন, এ ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা - ৭০০০০৭

সূচিপত্র

প্রকৃতি ও কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট পদ চিহ্ন

লিখেছেন – সোমনাথ কুমার দাস



নদীর কাজ

সামান্য বন্ধুর বা উচুঁ নীচু জমির ওপর প্রবহমান জলধারা (fluvial river) বা নদী সেখানে নিম্নক্ষয় (downcut erosion) এবং খুব সামান্য পার্শ্বক্ষয় (valley cut erosion) করে তৈরি করে বিভিন্ন আকৃতির গর্ত, মূলত বর্তুলাকার বা ছোট হাঁড়ি, গামলার মত গর্তগুলো আমরা মন্থকূপ বা poteholes বলে ডাকি।

তবে যেখানে সেখানে এগুলো তৈরিও হবে না। দামোদর অববাহিকায় ঘুরতে আসুন পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। সেখানে পটহোল কলোনি দেখতে পাবেন (poteholes familiy)।

এগুলো জন্ম নিতে গেলে দরকার নদী উপত্যকায় তুলনামূলক শক্ত বেলে বা গ্রানাইট জাতীয় আগ্নেয় পাথর, ব্যাসল্ট শিলাতেও এগুলো ভালো জন্ম নেয়।

জমি থাকবে সামান্য উচুঁ নীচু, আবহবিকারে সামান্য ক্ষত বিক্ষত করলে এগুলো গড়ে তোলা নদীর জন্য বেশ সুবিধাজনক বটে।

নদীর গতি শক্তি সামান্য বাড়তে হবে,

নদীর শক্তি বাড়ে ক্ষয় সীমার উচ্চতা ও জমির ঢালের তীব্রতার ওপর, নদীর কোথাও কোথাও খরস্রোত দেখা দিলেও নীচের উপত্যকায় এগুলো বিকাশ ঘটায়।

বিশেষ চরিত্রের মন্থ কূপ এর জন্ম

এই বন্ধুর পথে নদী ভ্রমণ করার সময় সামান্য নীচু ও ক্ষত স্থানে জল আটকে কিছুটা পিছিয়ে যায় এবং বাকিটা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, দেখা দেয় টারবুলেন্স। নদীর জলের সাথে বয়ে আসে ছোট পাথর ও কাঁকর বালি এসব, যারা ওই গর্তে আটকে পড়ে।

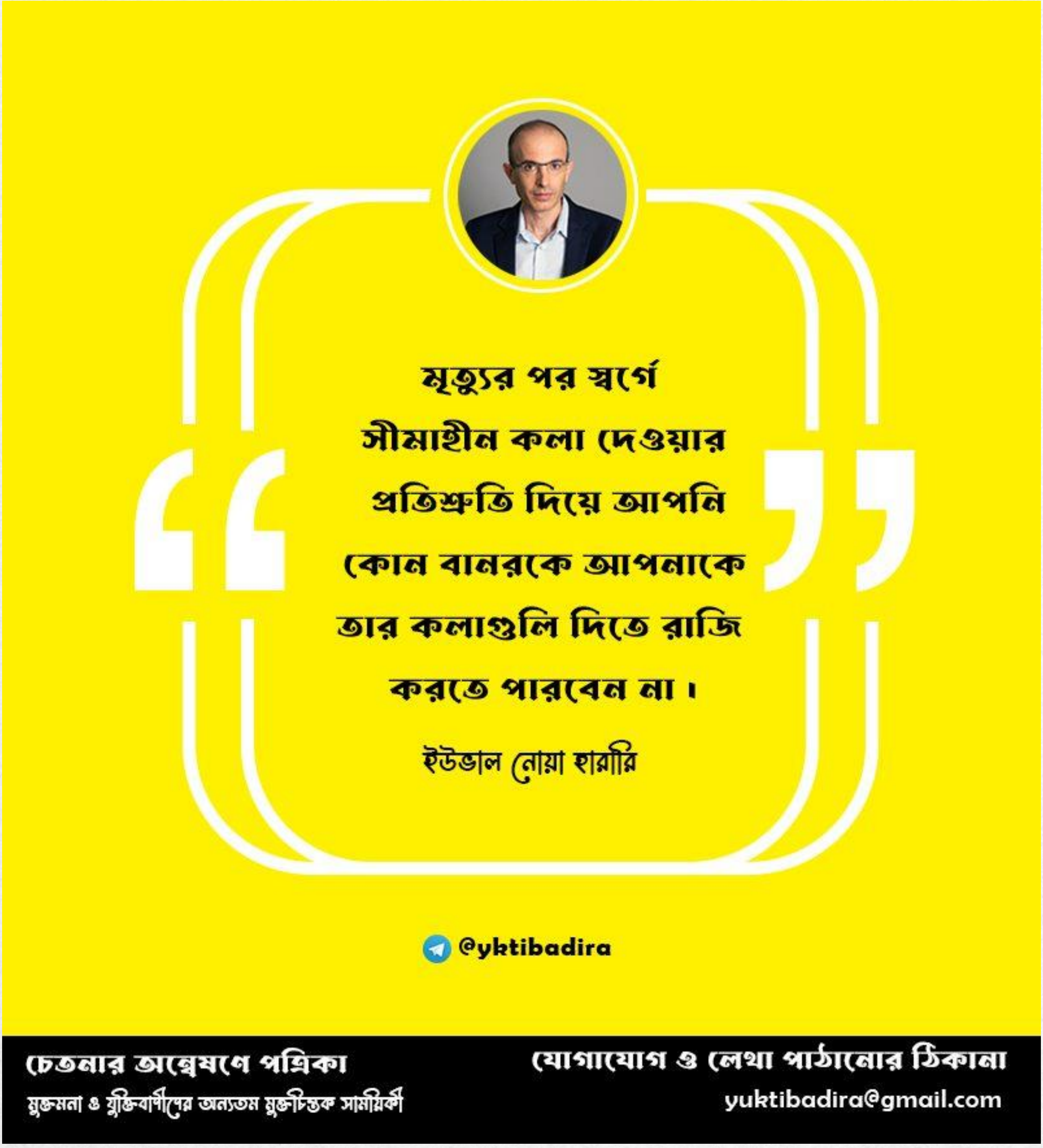
এখন সেখানে নিয়মিত জলে এসে পড়ে, সেখানে জল আটকে চারিদিকে প্রবাহ না হয়ে সামান্য ঘূর্ণন সৃষ্টি করে, এতে জলের মধ্যে থাকা কাঁকর পাথর নীচের উপত্যকার কঠিন পাথরের গায়ে ঘষা দিয়ে দিয়ে ক্ষয় করতে থাকে যাকে আমরা বলি অবঘর্ষ ক্ষয় (corrasion erosion)।
ঘূর্ণন গতির জন্য এখানে অপকেন্দ্র বলের (centrifugal force) প্রভাবে কেন্দ্র থেকে জল বাইরের দিকে বেরিয়ে যেতে চাই, এর জন্য চওড়া হয়ে গামলার মত গর্ত তৈরি করে দেয়। এখানে কোথাও ছোট কোথাও বড় কোথাও চওড়া বেশি হয়, কোথাও লম্বাটে হয়ে যায়, এগুলো নির্ভর করে নদীর গতিশক্তি, পাথরের কাঠিন্যতা এবং ক্ষয় ক্ষমতা। মূলত এখানে বিভিন্ন আকৃতির পেছনে জল গতিময় শক্তি (hydro dynamic force) কাজ করে।

নদীর জল প্রবল গতিতে এগিয়ে যাওয়ার সময় গর্তের মধ্যে আটকে ঘূর্ণন গতির সাথে সাথে জল প্রবাহ কোনও একটা নির্দিষ্ট দিকে বেশি ধাক্কা দেয়, সেক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষমতা সেই অংশে অনেক বেশি থাকে, প্রবল ক্ষয়ে অতি সংকীর্ণ লম্বাটে মন্থকূপগুলো জন্ম দেয়।

এই স্থানে পদ চিহ্নের ওপরের দিকে জলের ঘূর্ণন গতির ফলে গর্ত বেশ বৃত্তাকার হলেও সামনের দিকে জলের গতি শক্তির প্রভাবে জল প্রবাহ এগিয়ে এসে ক্ষয় করে বেশ চওড়া ও

লম্বাটে আকার নিয়েছে, তবে অতি শক্ত পাথর থাকায় নিম্ন ক্ষয়ের মাত্রা কম।

দ্বিতীয়ত, এগুলো পটহোল সৃষ্টির একদম প্রারম্ভিক পর্যায় রয়েছে। নদীর জলের মাত্রা কম বা বন্যার সময় এগুলো তৈরি করার কাজ চলে। এর মধ্যে পরিমার্জিত করে মানুষ হুবহু পায়ের চিহ্ন তৈরি করেছে।



সূচিপত্র

হুজুগে বিনোদন

লিখেছেন – রাজু দত্ত



হুজুগ হলো সেই আচরণ যা সাময়িকভাবে কোনও এক বা একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি করে, যা পারিপার্শ্বিক পরিবেশে দ্রুত সঞ্চারিত হয়। হুজুগ সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় হতে পারে। এই রচনায় আমি শুধুমাত্র বিনোদনমূলক হুজুগেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

এক বা একাধিক বিষয় কোনও একজন ব্যক্তির আগ্রহ থাকে, যা তাকে আনন্দ প্রদান করে, সাধারণভাবে আমরা তাকেই বিনোদন বলে থাকি। বিনোদন শব্দটিকেই ইংরেজিতে এন্টারটেইনমেন্ট বলা হয়, যে শব্দটির সাথে আমরা সকলেই সুপরিচিত।

বিনোদনের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। যেমন, বই বা সংবাদপত্র পড়া, গান শোনা, টিভি দেখা, সিনেমা দেখা, আড্ডা মারা ইত্যাদি। বর্তমানে অন্তর্জালীয় বিশ্বে ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, সহ বিনোদনের হাজারো বিকল্প মাধ্যম বিনোদনের দুনিয়াকে আরো সম্প্রসারিত করেছে।

যখন প্রথম দূরদর্শনের প্রসার ঘটলো, তখন বিনোদনের এই মাধ্যমটির প্রতি আমাদের অমোঘ আকর্ষণ ছিল। বর্তমানে স্মার্টফোনের প্রতি আমাদের আকর্ষণ মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে। আগামীদিনে এই মাধ্যমটির প্রতি আকর্ষণ থাকবে না। তার স্থান দখল করবে অন্য কোনও মাধ্যম। অর্থাৎ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিনোদনমূলক মাধ্যমের পরিবর্তন ঘটে।

সাম্প্রতিক সময় কিছু সাময়িক বিনোদন আমাদের কিছু সময়ের জন্য এতটাই আচ্ছন্ন করে রাখছে, যে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম, পারিপার্শ্বিক পরিবেশে সংঘটিত ঘটনাবলী, উদ্ভুত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল

সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় এই সকল বিষয়কে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন করে দিয়ে, মেতে উঠছি সেই সকল সাময়িক হুজুগে বিনোদনে। অতি সম্প্রতি এইরকম একটি হুজুগে মেতে উঠেছিলাম আমরা। 'কাঁচা বাদাম' হুজুগ। যা এই বিষয় একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

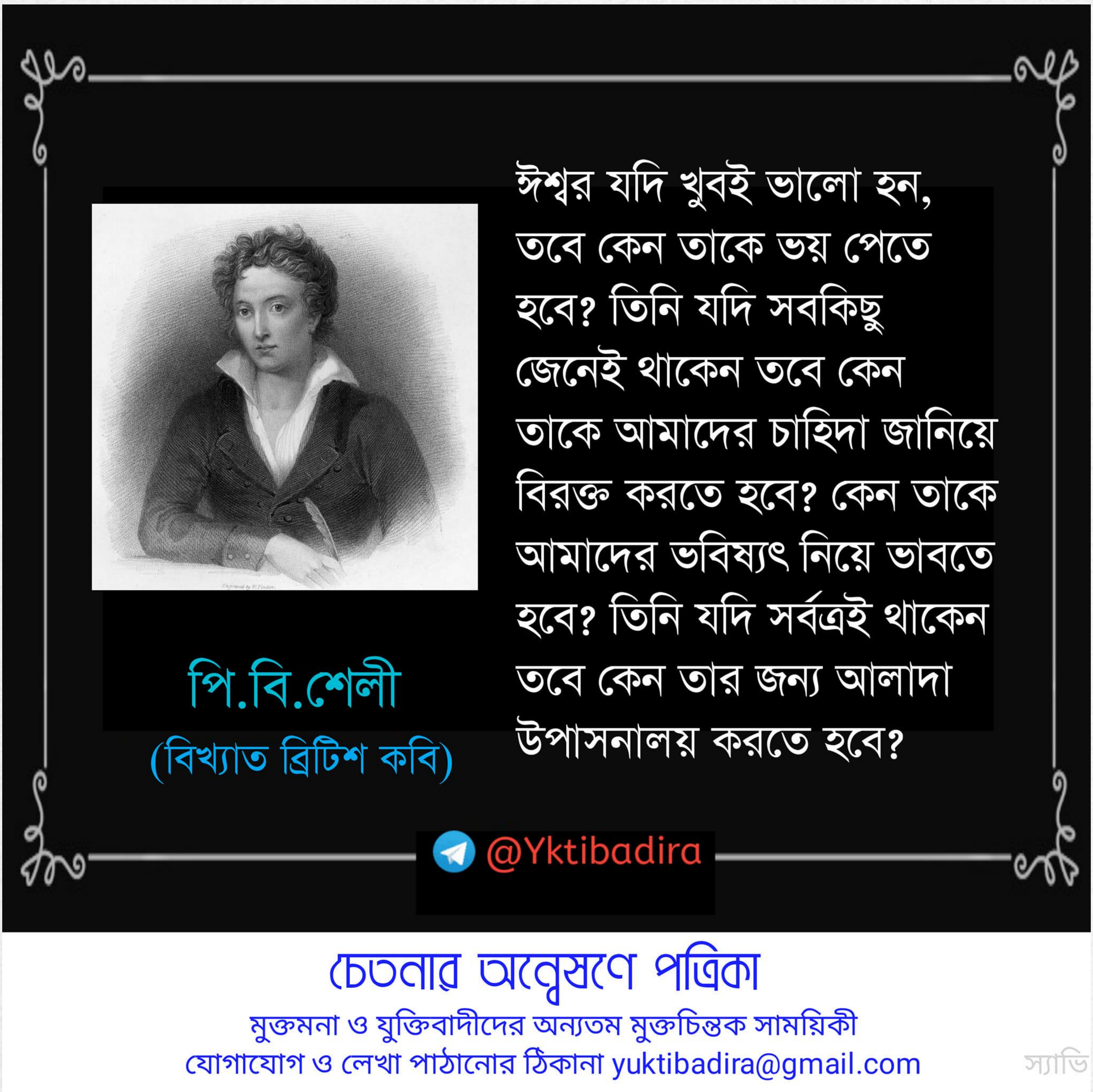
উল্লেখ্য হুজুগগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনও একটি সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে হয় থাকে। টুনির মা, কোলাভেরিডির হুজুগ পেরিয়ে আমরা চলে এলাম টুম্পা সোনা হুজুগে। তারপর, ম্যানিকে মাগে হিতে, কমলা নৃত্য করে এর হুজুগ পেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম কাঁচা বাদাম হুজুগে। তারপর এলো পুষ্পা, শ্রীবল্লি। এইভাবে আসতেই থাকছে হুজুগে গানের সম্ভার। গান শুনুন, একবার নয় ভালো লাগলে দশবার শুনুন ক্ষতি নেই, ক্ষতিটা নিজেদের বিপুল সময় এইসকল গানের পেছনে অপব্যয় করাটা।

শুধু গান নয়, আমরা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি দেখে এতটাই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছি, যে সেইসকল ঘটনাবলীকেই মূল আলোচ্য বিষয় করে নেওয়াকেই কর্তব্য মনে করতে শুরু করেছি। কোনও রাজনৈতিক নেতা বা সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্টজনেদের প্রতিটি আচরণ তো বটেই যে কোনও তুচ্ছ ঘটনাকেও অত্যধিক গুরুত্ব দিতে একেবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা। আমি নিজেও তার ব্যতিক্রম নই। কখনো কখনো আমিও এই সকল হুজুগের স্রোতে গা ভাসাই।

প্রশ্ন হলো, কেন এই সকল হুজুগের উৎপত্তি? কেনই বা খুব সহজেই স্বেচ্ছায় এইসকল হুজুগে মেতে উঠছি। এর মুখ্য কারণ, সমাজের পরিচালকরা এইসকল হুজুগে মাতিয়ে রেখে সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কথা ভুলিয়ে রাখতে চায়। যাতে করে আমরা এই সকল সমস্যা সমাধানে কোনওপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ না করতে পারি। সকল প্রকার বৈষম্য, কুসংস্কার, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, নারী নির্যাতন, দূর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা যাতে লড়াই না করতে পারি, আমরা যাতে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলে দূর করতে পারি সকল প্রকার অসাম্য। সমাজপতিরা তাই চায়। তাতে তাদের স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্নটি জড়িত যা আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত মানুষের স্বার্থ আর সংখ্যালঘু শোষক শ্রেণীর স্বার্থ এক হতে পারে না। একথা তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

কাজেই আমরা যদি জাতপাতহীন, বৈষম্যহীন, শোষণহীন, কুসংস্কারমুক্ত, সমাজ গড়ে তুলতে চাই, তবে এই সকল হুজুগে বিনোদনে অংশগ্রহণ করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। তা না হলে আমরা গড়তে পারবো না, আমাদের কাঙ্খিত সেই নতুন সমাজ। আমরা লড়তে পারবো না, সেই কাঙ্খিত সমাজ গঠনের অত্যন্ত কঠিন লড়াইটা। কারণ আমরা লড়বো উন্নত চেতনা দিয়ে, অযৌক্তিক, অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক হুজুগে বিনোদন আমাদের মনে সেই চেতনার জাগরণ ঘটাতে

পারবে না। কাজেই হুজুগে বিনোদন থেকে দূরে থাকুন, দূরে রাখুন সকলকে।



সূচিপত্র

ধর্ম বিশ্বাসী মাত্রই কি সুখী?

লি খে ছে ন – বি শ্ব জি ৎ চৌ ধু রী



একটা কথা আমরা প্রায়শই শুনি ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের সাথে কথা বলার সময় এবং পরিসংখ্যানগতভাবেও বিভিন্ন সার্ভেতে দেখি যে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ মাত্রই আদতে তুলনায় সুখী মানুষ আমরা যারা অবিশ্বাসী তাঁদের থেকে। কথাটি আসলেই একজন অবিশ্বাসী নাস্তিকের পক্ষে বড় ভাবনার বিষয়। তবে কি এই জাগতিক পৃথিবীতে সুখের খোঁজ পায় ধার্মিকরা তুলনায় বেশি একজন যুক্তিবাদী নাস্তিকের থেকে? এই ঘটনাটি এইবার একটু তলিয়ে দেখা যাক। আচ্ছা “সুখ” কথার অর্থ কি? মনোবিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনগত দিক থেকে সুখের সংজ্ঞা বিভিন্ন সময়ই নির্ধারণ করার চেষ্টা হয়েছে তবে মনোবিজ্ঞান বলছে সুখকে ইতিবাচক কর্ম ও আবেগসমূহের

সমষ্টি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এছাড়া ও তিনটে বিশেষ অবস্থাকে ও বিবেচনা করা হয় – আনন্দ, অঙ্গীকার ও অর্থ। অন্তত মনোবিজ্ঞান তাই বলছে। এইবার আমরা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধফলকে যদি একটু যাচাই-বাছাই করি তবে দেখব সুখ প্রধানত নির্ভর করে বিভিন্ন জাগতিক ও লৌকিক অবস্থানের ওপর তা আর্থিক, পারিবারিক বা সামাজিক যে কোন পরিস্থিতিরই ওপর হোক না কেন। আমরা জানি আমাদের এই জাগতিক পৃথিবীতে এমন কিছু সময় আসে আমাদের জীবনে যার ফলে এমন কিছু পরিস্থিতি তৈরি করে যা আমাদের মানসিক অবস্থাকে নেতিবাচক অর্থে নাড়া দেয় যার ফলে আমাদের শরীরে কিছু নেতিবাচক হরমোন ক্ষরণ হয় তাঁর ফলে অসুখী নামক মানসিক পরিস্থিতির স্বীকার হই। এইবার এই সুখী ও অসুখী নামক যে মানসিক অবস্থান তাকে একটু বিচার করা যাক।

আমরা যদি এই পৃথিবীর দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব, প্রকৃতি আদতে একটি প্রাণহীন নির্জীব জড়, যার কোনও ভালো-মন্দ, সুখ-অসুখ, ন্যায়-অন্যায়, অবিচার-সুবিচার, পাপ-পূণ্য বলে কোন নির্দিষ্ট সিস্টেম নেই প্রকৃতির মধ্যে। এই ধারণাগুলি আদতে মানব সমাজের বানানো নিয়ম, মনুষ্যসৃষ্ট। কেন মনুষ্যসৃষ্ট? কারন ডারউইনীয় মতে, প্রাণীর উদ্দেশ্য হল বংশবিস্তার সুতরাং, উন্নত মস্তিস্কের প্রাণী হিসেবে মানুষ তাঁর বংশবিস্তারের উদ্দেশ্যে তাঁর চারপাশে এমন এক পরিবেশ গঠন করেছে, যা তাঁর চারপাশে এক অনুকূল

পরিবেশ তৈরি করবে ও এই পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে প্রাণীর বংশবিস্তারকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, বিচার-অবিচার এইসব ধারণা মনুষ্যসৃষ্ট এবং মানুষ তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ ফলকে বিচার এই ধারণা মনুষ্য সমাজে নিয়ে এসেছে, কারণ তাঁর বংশবিস্তারের উদ্দেশ্যে অনুকূল পরিবেশ চাই এবং সেই পরিবেশ যদি উপরোক্ত নিয়ম-কানুন দ্বারা শৃংঙ্খলিত না হয় তবে মানবসমাজে এক বিপর্যয় নেমে আসবে এবং তাঁর বংশবিস্তারের ধারায় সংকট তৈরি করবে। যেহেতু মানুষ বিবর্তনের ধারায় একটি উন্নত মস্তিস্ক পেয়েছে তাই তাঁর বংবিস্তারের জন্য সমাজ এবং তাঁর নৈতিকতা নামক একটি সুশৃংঙ্খল ধারণা ও তৈরি করেছে। এমনি কিছু নৈতিকতার ধারণা অবশ্য কিছু প্রাণীদের মধ্যেও পাওয়া যায়, কিন্তু তা খুবই কম পরিমাণে কারন তাঁদের ছোট মস্তিষ্কের জন্য কারণ মস্তিষ্ক যত বড় হয়, তাঁর চিন্তার শক্তি ও তত বৃদ্ধি পায়। আমরা যারা যুক্তিবাদের চর্চা করি তারা এও জানি যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উৎপত্তির কারণ। প্রাচীন মানুষ ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি যখন হত তারা এগুলি কেন হয় যেহেতু জানত না, তাই তারা ভাবতো নিশ্চয়ই এগুলি কোন অলৌকিক শক্তি তাঁর দ্বারা এইসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ন্ত্রিত হয়, এই ধারণা থেকেই তারা বিভিন্ন ঈশ্বর নির্মাণ করে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে। এইবার ঘটনা হল, এইসব কাল্পনিক ঈশ্বরের ধারণা মানুষ যুগ যুগ ধরেই ডিএনএতে ধারণ করে এসেছে এবং বংশপরম্পরায় এই ঈশ্বরের শিক্ষা

তাঁর প্রজন্মোত্তর প্রজন্মের মাধ্যমে ছড়িয়ে এসেছে কিন্তু কেন? কারণ সেই ডারউইনের তত্ত্ব, প্রাণীর একমাত্র লক্ষ্য বংশবিস্তার, আর উন্নত প্রজাতির প্রাণী হিসেবে মানুষ, তাঁর এই বংশবিস্তারের জন্য সমাজ নিয়ম বিচার বানিয়ে এই বংশবিস্তারের পথকে আরো সুগম করার চেষ্টা করেছে দিনের পর দিন। এই বস্তুবাদী দুনিয়ায় বিভিন্ন মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় মানুষকে, যার ফলে মানব মস্তিস্ককে পজিটিভ ও নেগেটিভ হরমোনের ক্ষরণ সহ্য করতে হয়।

এইবার পজিটিভ হরমোন ক্ষরণ হলে, মানুষ সুখী অনুভব করে এবং নেতিবাচক হরমোন ক্ষরণ হলে মানুষ অসুখী অনুভব করে, এবং সুখী-অসুখী এটি সম্পুর্ণ একটি Mental State। এইবার আমরা জানি,মানুষ আদতে কখন অসুখী থাকতে চায় না। সে সুখী জীবন-যাপন করতে চায়। কিন্তু আমাদের এই জাগতিক লৌকিক পৃথিবীতে এবং তাঁর প্রকৃতির মধ্যে আসলে সুখী থাকার কোন নিয়ম নেই কারণ এই প্রকৃতি একটি নিজস্ব নিয়মে চলে। প্রকৃতির মধ্যে কোনও ভালোমন্দ বিচার অবিচার নেই, এমন কি মানুষ বাদে আর প্রাণীকুলের মধ্যে এই ধারণার কোনও অস্তিত্ব নেই, এই ভালো-মন্দ, বিচার-অবিচার ন্যায়-অন্যায় ধারণাটি একমাত্র Human Mind-এর একটি ধারণা। সে তাঁর উন্নত জীবনের জন্য এই ধারণাকে নিয়ে এসেছে কারন বংশবিস্তারের জন্য যা আগেই বলেছি। এইবার প্রকৃতিগত ভাবে সুখী থাকার জন্য মানুষ যখন বিভিন্ন জাগতিক কারণে অসুখী হয়ে পড়ে, তা সে

প্রাণ ভয় হোক, আর্থিক কারণেই হোক বা সামাজিক কারণেই হোক, তখন সেই মানুষ নিজের সুখ খুঁজতে, পৃথিবীতে বাঁচতে কোনও এক অলৌকিক সত্ত্বায় বিশ্বাস রাখে। তাঁদের যাবতীয় দুঃখ, মানসিক যন্ত্রণা ভয়কে সঁপে দেয় কোনও এক না দেখা অপ্রমাণিত সত্ত্বায় এবং বিশ্বাস করে সেই না দেখা অপ্রমাণিত সত্ত্বা যাকে বলে ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর তাঁদের রক্ষে করবে। এবং এমন বিশ্বাসে ভরসা রেখে তারা সুখী অনুভব করে, এবং পৃথিবীতে ধার্মিকদের সংখ্যা বেশী হওয়াতে স্বাভাবিক ভাবেই যে পরিসংখ্যান বলে অবিশ্বাসী নাস্তিকদের তুলনায় বিশ্বাসী আস্তিক, প্রাতিষ্ঠানিক ধার্মিকেরা বেশী সুখী। যদিও আমরা জানি ধার্মিকদের এই বিশ্বাসের আদতে কোন ভিত্তি নেই।

পৃথিবীর মানব ইতিহাসে যে বড় বড় বিপর্যয়গুলি ঘটেছে বা ঘটছে তাতে কোন ঈশ্বর এসে রক্ষা করেনি বরং লৌকিক পৃথিবীর উন্নত মানব মস্তিস্কের অধিকারী মানুষেরাই রক্ষা করেছে এবং তাঁর সবচেয়ে বড় প্রমাণ তথাকথিত ঈশ্বরের দেবভূমি যোশীমঠ ডুবে যাচ্ছে প্রকৃতির রোষে অথচ কোনও ঈশ্বর এসে তা রক্ষা করছে তো নয়ই বরং মানুষই এসে তাকে উদ্ধারের কাজে নেমেছে। সুতরাং ধার্মিক মাত্রই সুখী এটা ধার্মিকদের নিজস্ব ধারণা, তবে বাস্তব পৃথিবীতে তাঁর কোনও বাস্তবসম্মত প্রমাণ নেই।

সূচিপত্র

কিছু একান্ত কথা এবং চতুর

লি খে ছে ন - শু ভ্র

(১) কিছু একান্ত কথা

প্রশ্ন হইল, আমরা কি কেবলমাত্র তমসাচ্ছন্ন পথকেই আশ্রয় করিব? আমাদিগের সকল বিষয় ও বাসনারাশি রাজনীতি,ধর্মীয় কুসংস্কারের নিকট সমর্পণ করিয়া, তাহার অন্ধকারবৃত্তের অভিমুখে অগ্রসর হইব?

আমরা কি দৈহিক স্থূল আবেগের অনুবর্তী, না হইতে পারি না?

সকল শক্তি সংহত করিয়া অন্তঃস্থ শুদ্ধ চৈতন্যের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারি না?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রতিটি মানুষের অতি একান্ত, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতেই উৎসারিত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানী যেরূপ গবেষণাকার্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রসমূহ উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। সেইরূপ সকল আনুসন্ধানিক কার্যেই কিছু সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইয়া থাকে। উচ্চতর গবেষণাকার্যে একমাত্র চেতনাযুক্ত মন-ই এমন এক উপযুক্ত যন্ত্র।

দৈনন্দিন জীবনে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এমন এক কুসংস্কারমুক্ত চেতনাযুক্ত, মন প্রয়োজন। যা আমাদিগের স্থূল-দৃষ্টি বহির্ভূত বিষয়সকল উদ্ঘাটন করিতে সাহায্য করিবে।

তাই নয় কি? ভাবুন ভাবুন ভাবা প্র্যাকটিস করুন...

(২) চতুর

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

এক সময়ে একজন ধর্মীয় গুরু আমাদের প্রতিবাসী হইয়া আসিলেন। সকলকে ধর্ম সম্বন্ধে উৎসাহী করা তাঁহার প্রধান কর্ম ছিল। যেখানে কেহ একা আছে দেখিতেন, সেইখানে গিয়া গল্পকথা আরম্ভ করিতেন; কেহ তাঁহার কথা শুনিত, কেহ শুনিত না। অথচ তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, সকলেই তাঁহার কথা শুনিতে আগ্রহ করে।

একবার একজন শ্রোতা কৌতুহলী হইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার গল্পকথা ভাল লাগে,তবে উহাসকল প্রমাণিত করিতে পারিবেন?"

গুরু ঠাকুর উত্তর করিয়াছিলেন, “তা কেমন করিয়া হইবে, এখনও যে এ কথার অনেক বাকি। তুমি চুপ কর।”

বিনা মেঘে হঠাৎ করিয়া এমন গুরুতর আলোচনার মধ্যে, অমন প্রশ্নের অবতারণায় গুরুঠাকুর বোধহয় কিঞ্চিৎ হতবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাশ থেকে এক ভক্ত কহিলেন, "বুঝিতে পারিলেন না, বাবা অন্তর্যামী! আপনি মুখ খুলিবার পূর্বেই আপনার আসিবার কার্যকারণ সম্পর্কে সম্যক

অবগত হইয়া বসিয়া আছেন।" তবুও কথাগুলি প্রশ্নকারীর মনে ধরিল না। দুরু দুরু বক্ষে তিনি একটা প্রশ্ন করিতে যাইবেন, এমতাবস্থায় বাবা নাসিকা গর্জনের সহিত গভীর ধ্যানে তলাইয়া গেলেন। প্রশ্নকর্ত্তা আর মুখ খুলিতে সুযোগ পাইলেন না। ভ্যাবলাকান্তের ন্যায় ফ্যালফ্যালাইয়া শূন্য দৃষ্টিতে মহাজ্ঞানী মহাজনের জাগিবার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, বাবা চক্ষু উন্মোচন করিয়া ভক্তগণের দিকে চোখ রাখিয়া, পুনরায় তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

কিছুসময় পর, গুরুদেব পুনরায় দৃষ্টির ঝাঁপ অবনত করিলেন। প্রশ্নকারীর কৌতুহলী হৃদয়ে অবশ্য ইতিমধ্যেই এই ধারণা বাসা বাঁধিতে শুরু করিয়াছিল যে, ভাগিয়া যাওয়া ছাড়া তাহার সম্মুখে হয়ত আর কোন রাস্তা খোলা নাই। কিন্তু বাকীদের কী করিয়া উহাতে রাজী করাইবেন! সে নিজে সত্যের জন্য জীবন পর্যন্ত বিলীন করিতে প্রস্তুত থাকিলেও, বাকিরা যে ধর্মগুরুর প্রতি অনুরাগী! তাহারা কি তাহাদের অন্ধবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া এক সাথে পথে নামিতে উৎসাহী হইবে!? যদি অবাস্তববাদী চিন্তায় প্রভাবিত হইয়া বাকিরা ভাগিয়া যাইবার পরিকল্পনাকে খারিজ করিয়া দেয়! তাহা হইলে তাহাদের মনের চাবি ভাঙ্গিয়া, তাহাদেরকে দুঃসাহসী রোমাঞ্চভিলাষীতে পরিণত করিবার আর কোন কার্যকর পন্থা কি উন্মুক্ত থাকিবে?

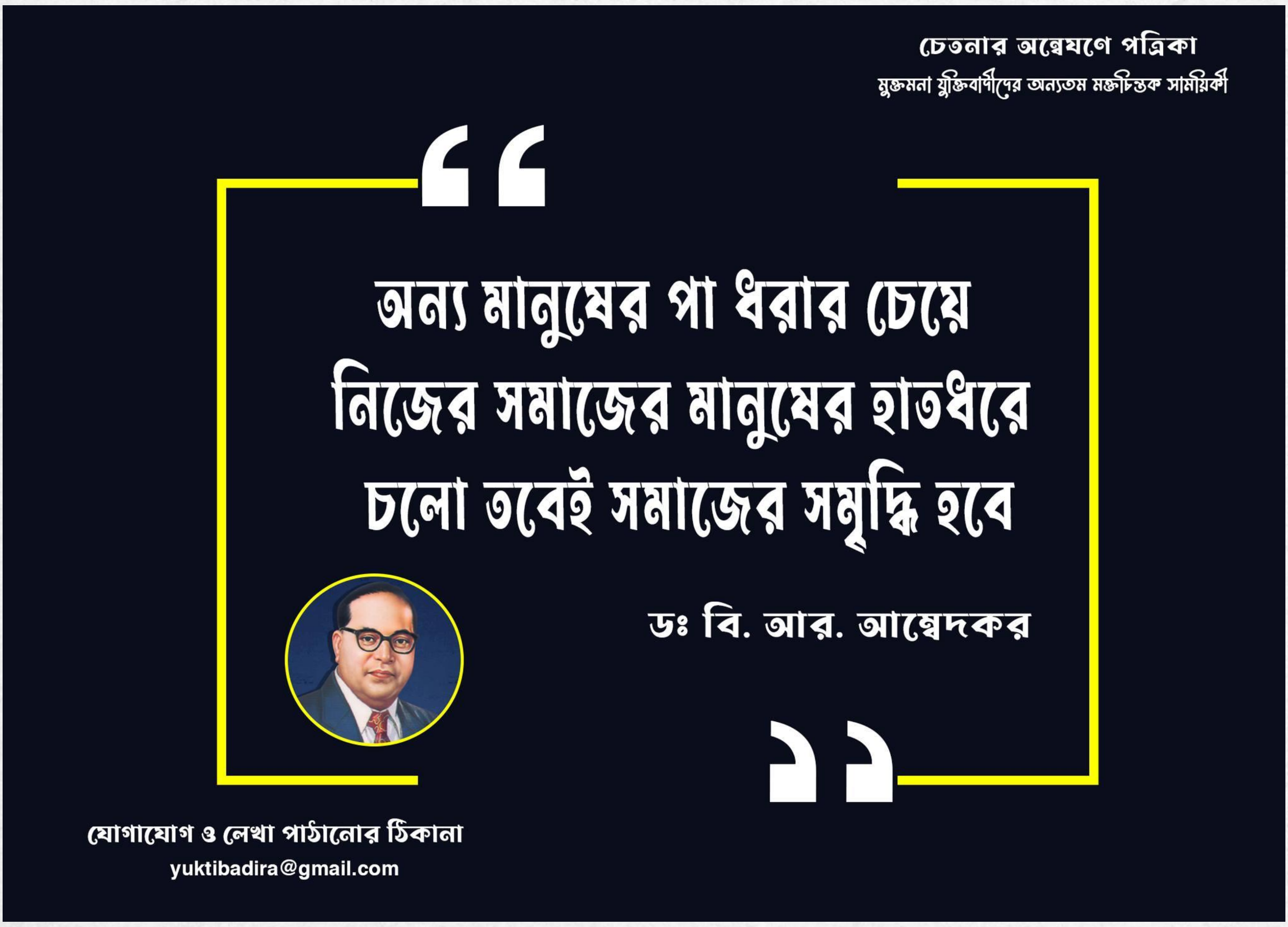
আবারও দৈববাণীর ন্যায় গুরুঠাকুরের মুখ হইতে ধ্বনিত হইল,-"ধর্মে প্রশ্নের স্থান নাই!" বলিয়া শুন্য হইতে একখানি তাম্বুল করগত করিয়া, ভক্তদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া দিলেন।

'অ্যাঃ'—বিস্মিত প্রশ্নকর্তা আর কোন শব্দ খুঁজিয়া পাইলেন না।

এমন সময়ে তিনি দেখিলেন,দর্শকাসন হইতে জাদুকরের ন্যায় একজন বড় পাগড়ী ও আলখাল্লা পরিহিত কোন এক ব্যক্তি, ধর্মগুরুর নিকট সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাহাকে গোষ্ঠীর দলপতির দরবারে লইয়া যাওয়া হইল। দলপতি অর্থাৎ গুরুঠাকুর পরম সমাদরে গাত্রোত্থান করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। এবং তাহাকেও শুন্য হইতে তাম্বুল আনিয়া দিলেন।

বিস্মিত শ্রোতা দেখিলেন, অদ্ভুতভাবে জাদুকরও অবিকল সেইরূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া প্রতিকর্ম দেখাইলেন। এবং তিনিও ধর্মগুরুর হাতে, শুন্য হইতে একখানি তাম্বুল লইয়া ধরাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া অপ্রকৃতস্থ হইয়া, ধর্মগুরু সস্নেহে জাদুকরের হাতখানি টানিয়া লইলেন। এবং ধীরে ধীরে তাহাকে অতি সুন্দর ভাবে কহিলেন, "তুমি যাহা করিলে, উহাতেও আমার ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল বলিয়াই, তাহা সম্ভব হইল!"

সব দেখিয়া বুঝিয়া, সেই শ্রোতার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু পাছে অসভ্যতা হয়,তাই বাহ্যিক কিছু প্রকাশ করিলেন না। গুরুঠাকুরের কথা শুনিয়া জাদুকর হাসিয়া নিবৃত্ত হইবা মাত্র, গুরুঠাকুরের একজন শিষ্য তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া যাইয়া, শিক্ষিত প্রণালী অনুসারে যথাসাধ্য সদ্ভাব জ্ঞাপন করিলেন। গুরুদেবের এই ঐশী ব্যবহারে উপস্থিত সকলেই যারপরনাই খুশি হইলেন এবং জাদুকরের প্রস্থানের পর তাহাদের ভক্তিযোগেও আর কোন গোল রহিল না।

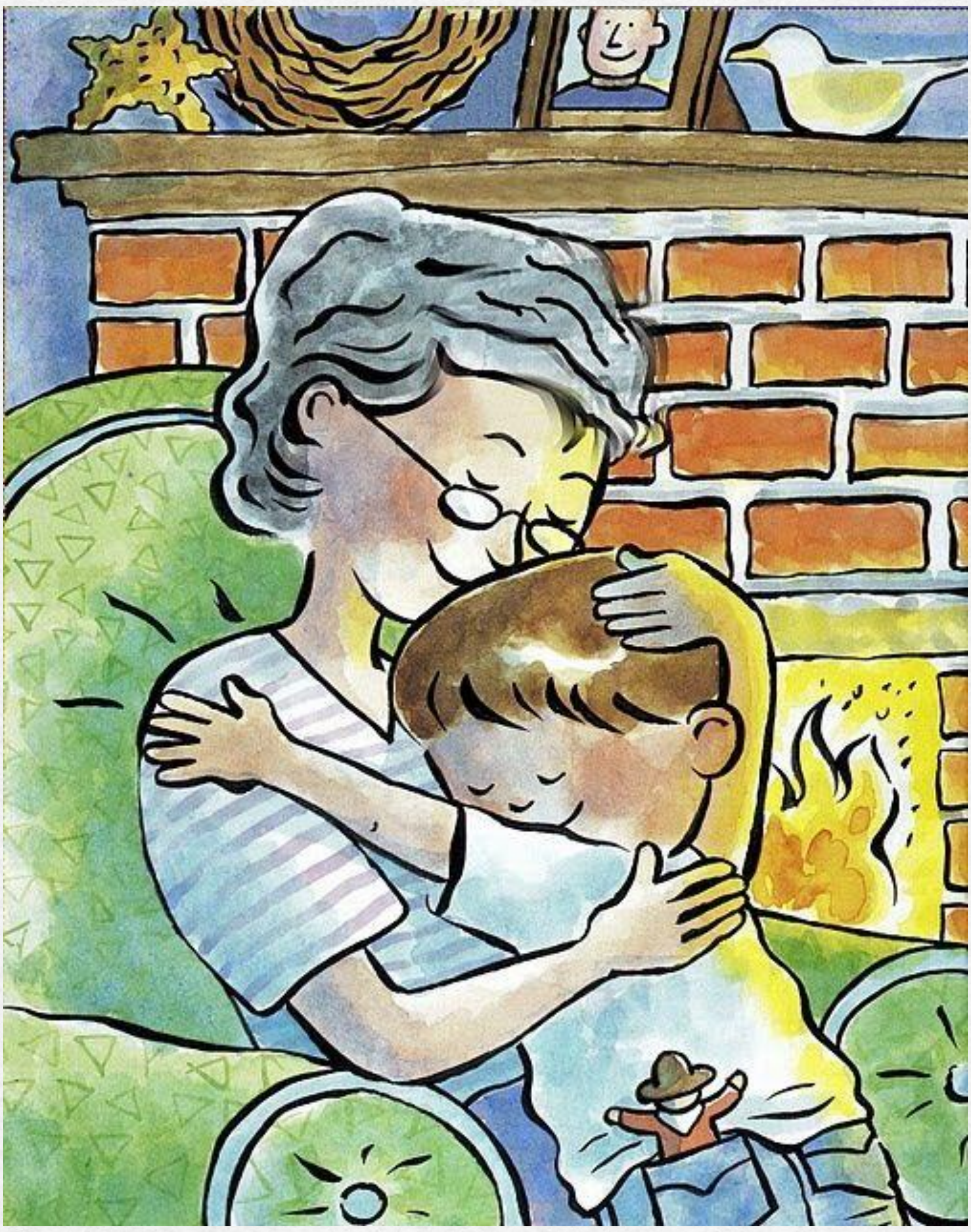


সূচিপত্র

ছোটগল্প:

ঠাকুমার স্বর্গলাভ

লি খে ছে ন – অ শো ক দা স চা র্বা ক



প্রাতস্নান সেরে, গরদের থান পরে, মুখে একটা ভক্তি ভক্তি ভাব মেখে শয়তানের ঠাকুমা নিস্তারিণীদেবী সেই কোন কাকভোরে ঠাকুরঘরে ঢুকেছিলেন। বেদীতে সাজানো কয়েকটি বহুল প্রচলিত দেবদেবী, জনপ্রিয় মহাদেব, নানা রঙের মাকালী, কালো কৃষ্ণ, ফর্সা কৃষ্ণ, শনি মনসা ইত্যাদি প্রাচীন ঠাকুরদেবতাদের ছবি, আধুনিক সন্তোষী মা, অবাঙালী

বজরংবলী, বিদেশি যীশু, বুদ্ধ, গড়গড়া সেবনরত মিষ্টি মিষ্টি করে হাসা মেদবহুল সবে দেবত্ব পাওয়া প্রেমময় গুরুদেব ইত্যাদি গুনে গুনে ছাব্বিশটি ফুল দেবতা, হাফদেবতা, কোয়াসি দেবতা, সব প্রজাতির দেবদেবী ও ভক্তদের দ্বারা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপিত উঠতি গুরুবাবা ভবিষ্যতের দেবতার ছবিগুলিতে একটি একটি করে মালা পরিয়ে এক এক করে পুজো সেরে প্রশান্ত মুখে এতক্ষনে বেরুলেন তিনি পাক্কা দুই ঘন্টা পরে। পাপের ভয়ে বেদীতে নিরাকার আল্লার ছবি না থাকায় তাঁকে মনে মনে নমস্কার করেছেন। কোনও ঝুঁকি নেননি তিনি। স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত। হাতে তাঁর পাথরের থালায় কিছু নকুলদানা ও ফুলবেলপাতা। এ বাড়ীর সবার হাতে একটি করে নকুলদানা প্রসাদ দিয়ে তাদের মাথায় ফুল বেলপাতা ছোঁয়াবেন কপালে প্রদীপের তাপ দিয়ে। সারাদিন ভালো থাকবে সবাই। কোনো কাজে বিঘ্ন হবে না কারো।

ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়েই ৫-৬ বছরের নাতি শয়তানের সাথে দেখা। শয়তান বলে উঠলো, - "এতক্ষন ঠাকুরদেবতাদের তেল মেরে কি আদায় করলে ঠাকুমা?"

- ছোটোকাকার কাছে এইসব শিক্ষা হচ্ছে, না? ছিঃ এত বড় বাড়ীর ছেলের মুখে কিনা এমন সব অসংসদীয় অভদ্র অভদ্র ভাষা! এরকম কথা আর বলো না।

- তাহলে বল ঠাকুরের কাছে কি চাইলে তুমি। নিশ্চই একটা ধান্দা আছে।

- কিচ্ছু চাই না ভাই, শুধু ঠাকুরের শ্রীচরণে একটু আশ্রয় চাই।

- কেন, তুমি কি রাস্তায় থাক, তোমার কি আশ্রয় নেই নাকি?

- তা, থাকবে না কেন। তবে সারা জীবনে তো অনেক পাপ করেছি, পরকালের জন্যও তো কিছু করতে-টরতে হবে।

- পাপের ফল তো তুমি পাবেই। পুজো করলেও পাবে, না করলেও পাবে। ঠাকুররাতো নেতা মন্ত্রী বা সরকারী অফিসার নয় যে তেল/ঘুষ খেয়ে, প্রকৃতির নিয়ম ভেঙে তোমার সব পাপ মকুব করে দেবে। আর মরার পরে দেবে স্বর্গে একটা দক্ষিণ খোলা ফ্লাট বা বাংলো।

- (স্বগতোক্তি: এ সব হচ্ছে অজিতের শেখানো বুলি। তোতা পাখীর মত মুখস্ত করেছে কিচ্ছু না বুঝে।) আর পাকামো করতে হবেনা তোমায়। ছোট তুমি, ছোটর মত থাকবে। বড়দের কথা শুনবে।

- ছোটকাকুও তো বড়, আমিতো ওর কথা শুনি। চার্বাকদাদুর কথাও শুনি।

- আবার তক্কো। নাও, প্রসাদ নাও।

- ই: রোজ রোজ শুধু নকুলদানা! তোমার কেষ্ট আর গুরুবাবদের যে ডায়াবিটিস হবে। মাটনরোল, চিকেন বিরিয়ানী, বিফ কাবাব, চকোলেট, আইসক্রীম - এসব দিতে পারোনা?

- আবার আজবাজে কথা। ঠাকুরদেবতারা কি এসব খাবার খান?

- কি খান তুমি জানলে কি করে? ছোটকাকু বলেছে যে, যারা ঠাকুর দেবতা, শাস্ত্র টাস্ত্র ফেঁদেছিলো তারা

নিজেরা যা খেত তাইই ঠাকুরদেবতাদেরকে দেবার ব্যবস্থা করে গল্প লিখে গেছে। আসলে তখনতো আর চাউমিন, নোডলস, ফুচকা টুকচা ছিলো না। তাহলে দেখতে তাদের অন্য রকমের মেনু বানাত কবিরা। এতদিনে মডার্ন ঠাকুরদেবতারা নিশ্চই আমাদের মত ফুড হ্যাবিট পাল্টিয়েছে। রিমোর্টে না খেয়ে কাঁটা চামচও ব্যবহার করছে। তাঁরা এখন তোমাদের ওই সেকেলে খাবার ছুঁয়েও দেখেন না। তুমি ওদের জন্য ভালো ভালো খাবারের ব্যবস্থা করো। আমার ভালো লাগেনা ওদের পচা পচা প্রসাদ খেতে। ওনারাতো সর্বভুক, যে যা নৈবেদ্য দেয় বিনা প্রতিবাদে খান। নররক্ত নরমাংসও খান নরবলির পর। ওনাদের মেনু পাল্টাও তুমি।

কানে হাত দিয়ে ঠাকুমা বলে উঠলেন, "ছি ছি, এসব কথা শোনাও পাপ। ঠাকুর দেবতাদের নিয়ে এসব কি রকম কুৎসা! তোমার মাথাটা একেবারে চিবিয়ে খাচ্ছে ঐ অজিতটা। যাচ্ছি তোমার বাবার কাছে। একটা বিহিত করতেই হবে।"

সোজা বড়ছেলের ঘরে ঢুকলেন নিস্তারিণী দেবী। রোজকার মত হাতে একটা নকুলদানা দিয়ে মাথায় ফুল বেলপাতা ছুঁইয়ে বললেন, "ছেলেটা যে অজিতের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাচ্ছে সেটা কি তুই দেখেছিস? পরলোকে যে জল পাবিনা ও ছেলের হাতে।"

শয়তানের বাবা খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে নকুল দানাটা চেবাতে চেবাতে দার্শনিকসুলভ ভঙ্গিতে বললেন,

"সবই ওপরওয়ালার হাত মা, সব তিনিই করাচ্ছেন, তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র। শাস্ত্রে লিখেছে।"

- সেটা অবশ্য আমিও মানি। তবে শুধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী, আর গীতার বাক্যের ওপর ভরসা করলেতো চলবেনা। নিজের ছেলের ভবিষ্যতের ব্যাপার বলে কথা। চোখ কান খোলা রাখতে হবে সব সময়। বলি শোন, শয়তানের নামে করা মাকালীর জোড়া পাঁঠার মানতটা এবার শোধ দিয়ে দে। মায়ের আশীর্বাদে কেউ ওর মাথা বিগড়ে দিতে পারবেনা।"

বাবা মারা যাবার পর মাতৃদেবী সারাদিন স্বর্গলাভের চিন্তায়/দুশ্চিন্তায় একপ্রকার মানসিক রোগী হয়ে গেছেন ঈশ্বরভক্তদের মত। খুব প্রেম ছিল দুজনের। মরার পর স্বর্গবাসী স্বামীর কাছে যেতে চান। মাকে খুশি করবার জন্য বড়কত্তা বলে উঠলেন, "কথাটা তুমি মন্দ বলোনি। আমারও তাই ইচ্ছা। অজিতকে বলে কালই পুরুত/জহ্লাদ ডেকে পূজোর দিন ঠিক করে ফেল।"

এমন সময় অজিত ঢুকলো ঘরে। বললো,"এতো হইচৈ কেন মা। আমার নামে কি চুকলি কাটছো দাদার কাছে?"

- হৈচৈ হবেনা! নিজেতো জাতধর্ম খুইয়ে দেশসেবা ছোটোলোকসেবা করে বেড়াচ্ছো, বাপ চোদ্দপুরুষদের মুখে চুনকালি দিয়ে পৈতেটাও খুলে ফেলে দিয়েছো। ইহকাল পরকালতো ঝরঝরে। কিন্তু দুধের ছেলে ভাইপোটাকে নাস্তিক বানাচ্ছিস কেন বলত। ঠাকুর

দেবতাদের বই না শুনিয়ে যত বাজে বই পড়ে শোনাচ্ছিস, আজেবাজে কথা শেখাচ্ছিস, যুক্তিবাদী ক্লাবে বক্তৃতা শোনাতে নিয়ে যাচ্ছিস। তোদের কুশিক্ষায় মুখে মুখে তক্কো করতে শিখেছে আজকাল - আমাদের সাথে এমন শত্রুতা করছিস কেন বলতো, কেন?"

- ঐটুকু বাচ্চার অপরিণত মাথায় ঠাকুদেবতার বদ চিন্তা ঢোকাচ্ছো কেন তোমরা? কেনইবা ওকে আস্তিক বানানোর চেষ্টা করছো? তোমাদের যেমন অধিকার আছে মনসা শনির পাঁচালী পড়ানোর, আমারও তেমনি কর্তব্য আছে ওকে বুঝিয়ে বলা যে ওগুলো সাহিত্যিকদের কাল্পনিক গল্প মাত্র। তোমার জটায়ু-গরুড়, ব্যাঙ্গমা - ব্যঙ্গমী, সুখ-সারির আজগুবি গল্পের মত। তুমিও ওকে ওর কাঁচা মগজটা ধোলাই করে আস্তিক করার চেষ্টা ছেড়ে দাও, আমিও নাস্তিক করার চেষ্টা ছেড়ে দেব। বড় হলে নিজের স্বাধীন চিন্তায় যেটা ভালো মনে করে করবে। আসলে আমি ডিফেন্সে খেলছি কিনা। তোমাদেরকে আক্রমণ নয়, তোমাদের আবেগে আঘাত করা নয়,আমি শুধু তোমাদের সংস্কারের বিষ থেকে শিশুটাকে বাঁচাতে চাই। আস্তিক্যরোগের ছোঁয়াচের আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে ওকে আস্তিক্যরোগের প্রতিষেধক খাওয়াচ্ছি।

- দেখ, সেদিনকার ছেলে তুই, বড় বড় কথা বলিসনা। তুই নাস্তিক, তুই তোর মত নিয়ে থাকিস। আমরাতো কিছু বলিনা। কিন্তু আমাদের বিশ্বাসে তুই আঘাত দিস কেন? আমাদের বিশ্বাস নিয়ে আমাদের বাঁচতে দে।

- তোমাদের গুরু ধর্মপ্রচারকরাও আমার মত অন্যের বিশ্বাসে অন্যের আবেগে আঘাত দিয়েছেন। মোহাম্মদ যীশু থেকে শুরু করে চৈতন্যদেব রামকৃষ্ণ - সবাই। সমসাময়িক আধমরা সমাজের প্রচলিত আবেগে আঘাত দিয়ে ওনারা যদি অন্যায় না করে থাকেন,আমি কী অন্যায় করলাম? তুমি কি বল বড়দা?

- তাই বলে বাপ ঠাকুর্দা চোদ্দপুরুষের রীতিনীতি, যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সনাতন ধর্ম বিসর্জন দিতে হবে নাকি?

- বিসর্জন তো দিয়েছিই। তুমিও দিয়েছ, আমিও দিয়েছি। আবার মা-ও দিয়েছে। তা না হলে তো বাল্যবিধবা পিসিমাও নতুন পিসেমশাইকে বিয়ে না করে কাশীর নোংরা পাড়ায় পচতে থাকতো,আর মাকেও বাবার চিতায় পুড়িয়ে মারতে হতো আমাদের।

নিস্তারিণীদেবী আর পারলেন না। সক্রোধে বলে উঠলেন, "সেটাই উচিত ছিল। তাঁর সাথে স্বর্গে যেতে পারতাম। আজ আর এমন হেনস্থা হতে হতোনা। তোদের কাছে এমন নরকযন্ত্রণাও সহ্য করতে হতোনা। ওগো তুমি কাদের কাছে রেখে গেলে গো"

- বিলাপ কোরোনা, কেউই এই পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে যেতে চায়না মা। তুমিও না। যতই নরকতুল্য হোক, যতই দুঃখকষ্ট থাক না কেন সবাই চায় এই পৃথিবীতে থাকতে, পৃথিবীটাকে ভোগ করতে।

ছেলের সাথে তর্ক করা বৃথা। পাশে দাঁড়ানো নাতির দিকে ঘুরে বলে উঠলেন, এয়াই শয়তান, কি

শুনছিস হাঁ করে? ছোটকাকার কথা খুব মন দিয়ে শুনিস, তাই না? খুব মিষ্টি লাগে? চলে আয় আমার সাথে। নাড়ু বানাবো দেখবি। ছোটোর সাথে একদম মিশবিনা। নরকে যাবি।

এক মনে নাড়ু বানানো দেখতে দেখতে শয়তান বলল, "ঠাকমা,তুমি কি সত্যি সত্যি স্বর্গে যেতে চাও?"

- স্বর্গে যেতে কে না চায় ভাই। সেখানে দেবতারা থাকেন। তোমার দাদুও থাকেন। আমিও তাঁদের কাছে যাবো। সেখানে না আছে কোন দুঃখ, না আছে কোনো জ্বালা যন্ত্রনা। শুধু অপার আনন্দ সেখানে। আমি পাপী, তাই এ বয়সেও পড়ে আছি এই পৃথিবীতে। মা কালীকে সারাদিন ডাকি কোলে তুলে নিতে। কিন্তু আমার পাপের শেষ না হলেতো তিনি নেবেননা। পৃথিবীর যন্ত্রনা সইতে হবে।

- তুমি কি তাহলে আমাদের চেয়ে দেবতাদের বেশি ভালোবাসো ঠাকুমা?

- ওরে আমার সোনাভাই, তা কখনো হয়! তুমি যে আমার নাড়ুগোপাল।

- শোনো ঠাকুমা, তুমি যখন স্বর্গে যাবে আমাকেও সাথে নিয়ে যাবে কিন্তু। আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না। এই আমি বলে দিলাম সাফ কথা।

- বালাই ষাট, এমন কথা মুখে আনতে নেই।

- কেন? সবাইতো সে দেশে যেতে চায়। মজার জায়গা। মামাবাড়ীর থেকেও মজার। তুমি এতো ভয় পেলে কেন। স্বর্গে আমি যাবোই তোমার সাথে।

- ছি: ভাই, এমন কথা বলো না। আমি বুড়ো হয়েছি। আর কটা দিনই বা বাঁচবো। তুমি এখন ছোট, কত বড় হবে, টুকটুকে বৌ আসবে, কত্ত আনন্দ করবে। এখন এসব কথা ভাবতে নেই।

- তুমি যে বলো স্বর্গেই আনন্দ, পৃথিবীতে শুধু যন্ত্রনা। পাগলা বোঁচাও এ কথা বলে।

- বড়দের সাথে এমন মুখে মুখে তর্ক করতে নেই। ঠাকুর পাপ দেয়। এখন তুমি ছোট আছ্, বড় হলে সব বুঝতে পারবে।

- আমি ছোট বলে ঠাকুরের কথা, স্বর্গের কথা বুঝতে পারিনা, তবে সেসব কথা আমায় বোঝাও কেন? ঠাকুর দেবতাদের মূর্তিকে 'নমো কর নম্ কর' বলে প্রণাম করতে শেখাও কেন?

উত্তর খুঁজে না পেয়ে যেন কিছুই শোনেননি ভাব দেখিয়ে উঠে গেলেন ঠাকুমা অন্তরের রাগ চেপে। আজকালকার এতটুকু বাচ্চাদের সাথে কথায় পারা যায়না। শুধু প্রশ্ন, আর প্রশ্ন। সক্রেটিস থেকে অমর্ত্য সেনরা ওদের শেষ করে দিলো।

দেখতে দেখতে কালীপূজার দিন এসে গেল। নাস্তিক হলে কি হবে, ছোট কাকার কালীপূজায় খুব উৎসাহ। পাঁঠার মাংসের ওপর ওর একটু দুর্বলতা আছে। শয়তানকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই ঠাকুর কিনে নিয়ে এলো পছন্দ করে। ও অবশ্য মূর্তিটিকে পুতুল, আর পুজোকে পুজো-পুজো খেলা বলে। ছাতের ওপর নিজের হাতে তৈরী করে প্যান্ডেল।

আর্টিস্ট মানুষ, সাজিয়েছে সুন্দর। ঠাকুরের মুখের খুঁতটা তুলি দিয়ে ঠিক করে দিল। শয়তান তার প্রিয় কাকুকে সাহায্য করে রং, তুলি, কাঁচি ইত্যাদি জিনিস এগিয়ে দিচ্ছে। ঠাকুমা ফল কাটছেন, নৈবেদ্য সাজাচ্ছেন। শয়তানের মা মশলা বাটছেন আগামীকাল বলির মাংসপ্রসাদ রান্নার জন্য। ঠাকুর সাজাতে সাজাতে শয়তানের এটা ওটা হাজার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে তার ছোটকাকু। মা কালীর মুখটা রক্তাক্ত কেন, তিনি কি কাঁচা মাংস খান? তিনি কি আফ্রকার মেয়ে?

ঠাকুমা কি জন্য একটা কাজে নিচে গেলেন। শয়তানকে বলে গেলেন নজর রাখতে যেন কাকেরা নৈবেদ্যে মুখ না দেয়।

ছোটকাকু ঠাকুর সাজাতে সাজাতে বললো, দেখলি শয়তান, মা কালী নিজের খাবারটাও বাঁচাতে পারে না সামান্য কাকের থেকে। যেটা তুইও পারিস। এটা তোর ঠাকুমাও জানে। শুনেছি সবচেয়ে বড় কালীঘাটের কালীর সোনার জিভটা চোরে খুলে নিয়ে গেছে। এই ঠাকুর নাকি বড় বড় শত্রুদের হাত থেকে আমাদের বাঁচাবে!

শয়তান হঠাৎ করে তোতা পাখীর মত খুব গম্ভীর হয়ে বললো, "তুমি আমার সাথে এমন কথা বলবেনা। ঠাকুমা শুনতে না করেছে। শেষ পর্যন্ত আমি নরকে যাবো নাকি?" একেবারে ঠাকুমার ভাষা।

ওর বলার ভঙ্গি দেখে অজিত হো হো করে হেসে উঠলো। এমন সময় নিস্তারিণী দেবী ফিরে এলেন।

অজিতকে বললেন, "আজকের দিনটা রেহাই দে বাবা। ওর নামে উৎসর্গ করা পূজা। ওর মাথাটা আর খাসনা।

গভীর রাতে পুজো। চারিদিকে একটা ভয় ভয়,ভক্তি ভাব। পুরুত ঠাকুরের চোখ রক্তবর্ণ। প্রচুর কারণবারি পান করেছেন। পরনে লাল চেলী। কপালে বড় একটা লাল তেলতেলে টিপ। গলায় জবাফুল ও রুদ্রাক্ষের মালা। বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক। নরবলি দেওয়া মড়ার ওপর বসে কালীসাধনা করে 'সিদ্ধ' পুরুষ হয়েছেন বলে আধ্যাত্মিক গুজব।

অনেক সময় নিয়ে তিনি গুরুগম্ভীর গলায় নানা অঙ্গভঙ্গি করে পূজার্চনা ও মন্ত্রপাঠ করলেন দক্ষ অভিনেতাদের মত। এবার বলি হবে। কালো কালো নধর দুটি ছাগশিশু দু তিন দিন আগে রাজাবাজারের পাঁঠাবাজার থেকে এসেছে। ছাগলদুটিকে ভালোবেসে ফেলেছে শয়তান। পার্ক থেকে ঘাস ছিঁড়ে এনে খাইয়েছে, পাউরুটি খাইয়েছে। ওদের বলি হয়ে যাবে এখুনি। শয়তানের মন তাই খারাপ। তার দুদিনের বন্ধু আজ মরে গিয়ে কালীঠাকুর আর তাঁর ভক্তদের পেটে ঢুকবে।

ছাগলদুটিকে চান করিয়ে নিয়ে আসা হলো। তাদের গলায়ও জবার মালা। কপালে লাল টিপ্। শয়তান ওদের অবস্থা দেখে চোখে আর জল রাখতে পারছেনা। ওদের প্রাণ বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছিল শয়তান।

বাবা,মা,ছোটকাকু কেউ ওর কথা শোনেনি। ঠাকুমাকে বলেছিল, "ওদের না মারলে হয়না?"

ঠাকুমা ওর মুখ চেপে ধরে বলেছিলো, "ওকথা বলতে নেই, মাকালী পাপ দেবেন "

শয়তান বললো, "ওরা কি দোষ করেছে যে ওদের গলা কেটে ফেলা হবে?"



ঠাকুমা বললো, "ওরে বোকা, ওরা অনেক ভাগ্যবান। মা ওদের গ্রহণ করবেন। ওরা স্বর্গে যাবে। ওদের জীবন স্বার্থক"

প্রচণ্ড জোরে ঢাক বাজছে। ছাগলদুটির মাথা একসাথে হাড়িকাঠে ঢোকানো হলো। চিতায় জোর করে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরা সতীদের আর্তনাদ যেমন ঢাকের আওয়াজে ঢাকা পড়ে যেত, ছাগলগুলির ব্যা ব্যা শব্দও চাপা পড়ে যাচ্ছে।

শয়তান আর থাকতে পারছেনা। খুব জোরে জোরে নিঃস্বাস নিচ্ছে। বুকটা বোধ হয় ফেটে যাবে তার। এমন সময় বিকট শব্দে "মা মা" বলতে বলতে বিশাল খাঁড়া হাতে মাতাল সিদ্ধ পুরুষটি এক কোপে কেটে ফেললেন ছাগল দুটিকে। কাটা ধড় দুটো ছটপট করতে লাগলো মাটিতে লুটিয়ে। একবার চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল শয়তান।

চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়ে ওর ঠাকুমা ওকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজেও তার পাশে শুয়ে পড়লেন। শয়তানকে বললেন,"ছাগলদুটোর কি ভাগ্য! মা কালী ওদের দেহ ভোগ করলেন। আমরা কালকে মায়ের প্রসাদ খাবো। ওরা স্বর্গে চলে গেল। ওদের জন্য দুঃখ করতে নেই।"

- তাহলে তোমাকেও বলি দিতে ঐ রাক্ষস পুরুতটাকে বললেনা কেন? তুমিওতো স্বর্গে যেতে চাও। কালকে পুরুতকে বলে আমি তুমি দুজনেই বলি হয়ে স্বর্গে চলে যাবো"

এ কথা শুনে ঠাকুমা ভয়ে আঁতকে উঠলেন। ছেলে বলে কি। ঠাকুমা উত্তরহারা। শেষ রাতে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরবেলা হঠাৎ ঢাকের শব্দ আর ঠাকুমার ভয়ার্ত চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল শয়তানের। ঘুমের ঘোরে ঠাকুমা হাড়িকাঠে ঢোকানো পাঁঠার মত আর্ত চিৎকার করে বলছেন, "আমায় বলি দিওনা, আমি স্বর্গে মা কালীর কাছে যাবোনা, আমি এই পৃথিবীতেই থাকতে চাই"।

শয়তান ঠাকুমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, "কেঁদোনা ঠাকুমা, আমি আর স্বর্গে যেতে চাইনা। তুমিও যাবেনা, আমিও যাবনা, কালীর প্রসাদও খাবনা "

হুঁশ পেয়ে ঠাকুমা বললেন, আজ থেকে তিনি পুজো আচ্ছা ছেড়ে দেবেন। স্বর্গের স্বাদ তাঁর মিটে গেছে। ঠাকুমার কথা শুনে দরজায় দাঁড়ানো অজিত হাততালি দিতে লাগলো হাসতে হাসতে।

মূল রচনা - কলকাতা ডিসেম্বর ১৯৯৫

সামান্য সংশোধিত - সানফ্রান্সিসকো - ২০১৮

সমালোচনা: asokdas.godless@gmail.com

কবিতা:

সূচিপত্র

মুক্তি

লি খে ছে ন- প্র দী প চ ক্র ব র্তী



শিক্ষা নিয়ে গর্ব করে
করছ সময় নষ্ট,
কুসংস্কার বাড়ছে রোজ-ই
বাড়ছে মনোকষ্ট।

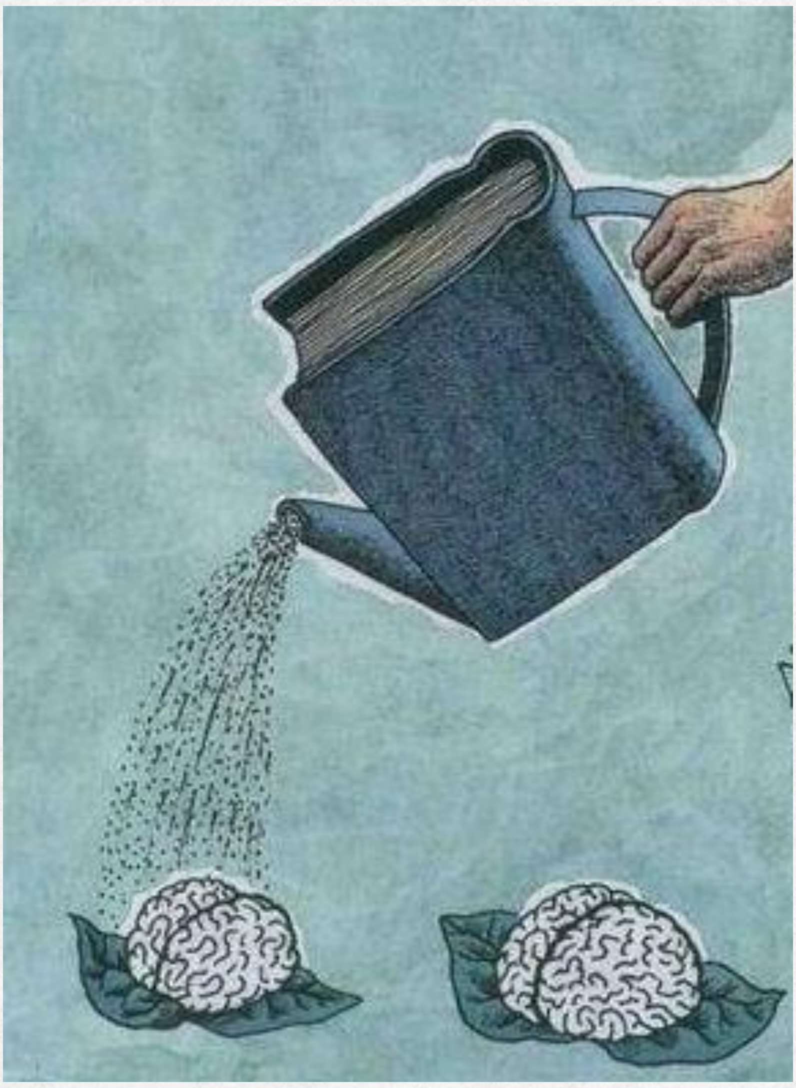
শিক্ষিত হওয়ার আগে
হতে হবে যোগ্য,
কর্মফল-ই শেষ কথা
চুলোয় যাক্ ভাগ্য।

মহাকাশের দুনিয়াতে
আছে কার্য - কারণ,
অলৌকিকের ধ্বজাধারীদের
সেথায় প্রবেশ বারণ।

ধর্মগ্রন্থ তাকেই বলে
যেথায় আছে যুক্তি,
মানবতাই দিতে পারে
ভিক্ষা থেকে মুক্তি।

চেতনা

লিখেছেন - বিপ্লব সেন



নিজের শিক্ষা নিজের চেতনা
কি এই কথা কয়,
কান পেতে শুনুন দাদা উত্তর আছে সেথায়।
যদি বিবাহ করেন কাউকে
করুন পরীক্ষা রক্ত,
ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবন তাতে
হবে যে শক্ত।

বিজ্ঞানে ভরসা রাখুন

মানুষের সাথে বন্ধন,
মাঙ্গলিক কাল্পনিক ব্যাপার
ব্রাহ্মণের ব্যবসার মন্থন।
ছুঁড়ে ফেলে দিন সামন্ত তান্ত্রিক
এমন চিন্তা ভাবনা,
মানুষ শুধুই মান হুশ জ্ঞানে
এটাই হলো চেতনা।
বিজ্ঞানের কথা বলি আপনাকে
একটু ভেবে দেখুন,
পরিবর্তনের এই পৃথিবীতে ভরা
দ্বন্দ্ব আর ঘূর্ণন।

কারুর সাথে সম্পর্ক নয়
অন্য কিছু দিয়ে নিয়ন্ত্রন,
সমাজের মধ্যে মানুষের মধ্যে
সম্পিরখে দ্বন্দ্বের সমাগম।
একসাথে থাকতে থাকতে
হতে পারে কিছু অনৈক্য,
সমস্যা থাকলে আছে সমাধান
এভাবেই হয় ঐক্য।
কার্য থাকলে থাকবে কারণ
কারণ থাকলে কার্য,
এটাই হলো সুস্থ চিন্তা
মাঙ্গলীক সব কিছু বর্জ্য।

সুস্থ থাকতে পরীক্ষা করুন
রক্ত বিয়ের আগে,
জিন গঠিত রোগ যাতে
আটকে যায় আগে ভাগে।
বৈজ্ঞানিক চিন্তা করুন
এটাই চিন্তা মুক্তি,
প্রত্যেক ঘটনার কার্য কারণ
বাড়ায় বাস্তব শক্তি।

সূচিপত্র

যুক্তিবাদের জয়

লি খে ছে ন - বি প্ল ব সে ন



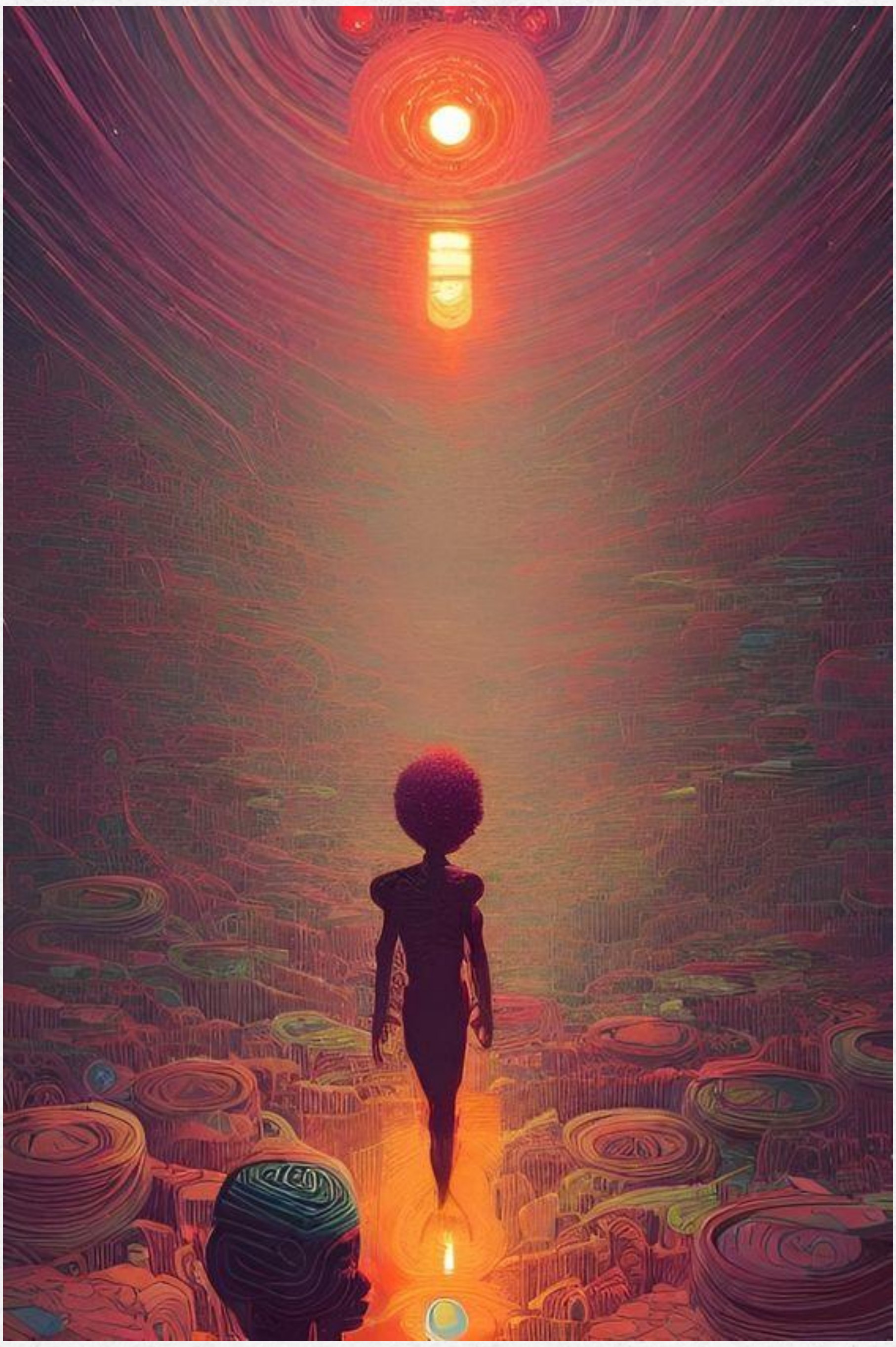
সংঘর্ষ চলুক চলুন নির্মাণ
ভেঙে পড়ুক অবক্ষয়,
মুক্ত চিন্তা যুক্তির আলোয় হোক
বস্তুবাদের জয়।
তর্ক থাকুক থাকুক বিতর্ক
থাকুক সংশয়,
দ্বন্দ্ব থাকুক চেতনার মাঝে
জ্ঞানের আপেক্ষিকতায়।
কার্য থাকলে থাকবে কারণ

এটাই সহজ কথা,
কারণ থাকলেও থাকবে কার্য
এভাবেই চেতনার দেখা।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা সৃষ্টি করে
সিন্ধু,
ওই সিন্ধুর একক কিন্তু
একটি জল বিন্দু।
প্রগতির পথে চলমান বিজ্ঞান
যুক্তিবাদী মন,
উঠুক ঝড় ভাঙুক বিশ্বাস
সংশয় নিয়ে চলুক" চেতনার অন্বেষণ।"
সবেতেই বিশ্বাস সবেতেই আনুগত্য
অদ্ভুত অন্ধকার,
বিচ্ছিন্ন নয় সামগ্রিক ভাবে
দরকার চিন্তা ভাবনার।
প্রতি ঘটনা জড়িত যে
অন্য ঘটনার সাথে মিশে,
পরিবর্তনের এই পৃথিবী পাক খেয়ে চলে
এই দ্বন্দ্বের পরিবেশে।
ভাবুন, ভাবুন, ভাবার অনুশীলন
করুন এটাই অনুরোধ,
বিশ্বাস নয় সংশয় নিয়ে
চেতনায় আসুক মূল্যবোধ।

সূচিপত্র

আলোর দিকে যাত্রা

লিখেছেন – দেবব্রত হাতী



অন্ধকারে হালকা আলোক রেখা
সাম্যের চেতনা গভীরে প্রোথিত
মুক্তমনা সমাজে সবাই শাসক।
জীবন যখন বিপর্যস্ত মরুভূমি
মনন সৃজনশীল ও চিন্তাশীল করা।
রাজনীতির নানা দ্বন্দ্ব, অসহিষ্ণুতা
মনের মাধুরী মেশানো কথা নয়

আদর্শের কন্টকিত পথ ধরে চলা।
ভাঙা হৃদয়ে গান গাওয়া
স্বাধীনতা,গণতন্ত্র ও মুক্তি
মুক্তির জন্য বৃহত্তর সত্য
সেই সত্যের কাছে আসা।
সত্যই সুন্দর,জীবনের শ্বাশ্বত সত্য,
মানুষের জীবনযুদ্ধ অবিরাম চলা
ধোঁয়াশায় ঢাকা পড়ে সত্য ভাষ্য
চশমার কাঁচটা বড়ো ঘোলা ঘোলা
মনে হয় সব যেন ঝাপসা ঝাপসা
ঝাপসা থেকে আলোর দিকে যাত্রা।

উপেক্ষিতা

লিখেছেন – সজল কান্তি টিকাদার



ভারতবর্ষকে আমরা সবাই
জননী বলেই জানি---
আবার এই সমাজই মা বোনের
করে যে মান হানি!
ধর্ষণ আর বধূ নির্যাতন
প্রতিদিনই ঘটে--
চার বছরের শিশু সেও
ছাড় পায় না মোটে!

সরস্বতী পূজোয় পুষ্পাঞ্জলি
দেয় যে ভক্তি ভরে---
কেমন করে এরাই আবার
ভ্রুণ হত্যা করে!
তখন বিবেক কোথায় থাকে
দেখাও তো একটু দেখি--
এমন পূজোয় লাভ নেই বন্ধু
এগুলো সব মেকী!

এই সমাজেই ঘটছে বন্ধু
নির্ভয়া কামদুনি
হাজার হাজার ঘটছে এমন
কতটুকু তার শুনি?
যে সমাজ পারে না দিতে
নারীর সন্মান অধিকার
তেমন সমাজ রেখে বন্ধু
আমাদের কি দরকার?

নতুন শিশু আসবে যখন
এই সমাজের মাঝে---
কি জবাব দেবে তুমি?
শুনি তোমার কাছে!
আগুন জ্বালাও সমাজ বুকে

আর তোমার মনের ঘরে---

নতুন সমাজ তবেই বন্ধু

উঠবে আবার গড়ে।

সূচিপত্র

বিশেষ সংযোজন:

গৌরী লঙ্কেশ

এই মাসেই জন্মেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ। উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হন তিনি। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পত্রিকায় তাঁরই একটা লেখা।

The Political Discussions Around One Word.. Hindutva and Indianness

Written by - Gouri Lonkesh

Any word that describes a particular, important aspect of society has its own history, meaning, culture, and ideology. Not just that, but the community’s ways of being is also hidden in this word. Thus, for all these reasons, the word is part and parcel of the lives of a community.

For example, let's take the word secularism. There is a struggle of delineating religion and dominion behind this word. It has Buddhism's love for humanity, the essence of Basava religion, blood of Gandhi's assassination, and this country's constitutional motivation.



The word that stands in opposition to this word is Hindutva. Even the word Hindutva has its own history: upholding the varna system, re-enforcing the caste system, protecting the interests of upper castes, ostracising a variety of communities, nurturing communal instincts,

oppressing Shudras and women, seeing Dalits as impotent are all part of manuvada.

Indians now stand in a position to choose between these two oppositional words, each of which have their own histories, knowledge, and character. Their decision will turn the fate of this country.

My inspiration to talk about the importance of this is an interview of Prime Minister Vajpayee, who as usual used his skill of weaving words. Answering a question on secularism and nationalism, Vajpayee said, speaking in Hindi, “Bharatiya aur hindutva ka arth ek hi hai. Par main Bharatiyata kehana pasand karoonga. Hamare yahan Hindutva wale bhi hai.”

“The meaning of Indianness and Hindutva is the same. But I like to use the word Indianness. We have proponents of hindutva living here in our country.”

Even though he has weaved words in a terrible manner before, he is a self-proclaimed poet, isn't he? Vajpayee possesses the magic to weave words that a poet needs. But sadly, in reality, Vajpayee doesn't have the peculiarities of a poet's heart.

This is because he has a parochial attitude when it comes to the complexities of a word. He negates the different aspects that a word possesses. He sucks out the character that a word possesses and makes it utterly useless. Vajpayee, who disrespects the culture constituted in a word, is no poet at all. Even then, he is able to conceive of a way to erase all the complexities that words carry.

Try, again, to understand the sentence, "the meaning of both the words – hindutva and Indianness is the same" through Hindutva ideology. According to the proponents of Hindutva, as everyone is now aware, the ones who aren't part of or haven't joined Hindu religion, the ones who do not accept the

importance of Hindu religion, and the ones who do not accept the ideology of Hindutva, aren't Indians at all.

Now, Vajpayee has gone one step further by saying that hindutva and Indianness means the same. Try to look at his statement with a different view. According to him, the ones who do not accept Hindutva aren't Indians. If that is so, since I have been born and live in this country and I do not accept Hindutva, which country do I belong to? If people like me aren't Indians, then who are this country's citizens? Not just that, which dominion do the followers of Buddhism, Jainism, Sikhism belong?

Not just Christian-Muslim minorities, the ones who were outcasted by Hindu priests such as Lingayats, Okkaliga, Kuruba, Dalits, which country are they from, if they are not Indians?

Just because someone knows how to weave words, one neither becomes a poet nor a statesman. Vajpayee is a living example of this.

Because a poet is not someone who just weaves words – a poet knows the peculiarities when it comes to the craft of language, she is someone who harvests and protects both the language as well as the sentiment behind the words. Only then the meaning of a language expands and grows instead of deteriorating. A word gets its life only when it is part of a community's way of life, only when it has a deep relationship with people's lives.

For example, let's take the word nationalism. It can express, at the same time, a broad meaning and a short-sighted narrow feeling. In the expansive sense, nationalism expresses a community's way of life, rituals, notions, history among other things. Even though one might not know each other, it suggests that they are the inheritors of all the aspects of a nation. But when you restrict this word to a particular religion in a country like India, which has multiple cultures, religions, languages, and other complexities, it becomes absolutely short-sighted. If we do this, one would be erasing

about 98% of the culture that exists and thus disrupt and disintegrate everything.

This is the difference between Indianness and Hindutva. Indianness is a word which is broad and expansive, inclusive of everyone and everything. It contains intangible thoughts and notions as well as the tangible land, water, wealth – thus, a signifier of the world itself. The word that is in opposition to this is “Hindutva”. This is a narrow word which separates and divides people, denying the lives of many communities who are living in harmony, and imposes a monoculture of one language and one religion.

By equating these two words, self-proclaimed poet Vajpayee, committing disservice to language, has taken the Hitler’s path. Vajpayee, an anti-national enroute to corrupting the word “Indianness”, is prospering today. Because of Vajpayee’s actions, a man who seems to have mastered the tact of repeating a lie times until it seems indistinguishable from the truth, our

lives will become meaningless if the word "Indianness" loses its meaning in a year.

The responsibility to stop this ideological onslaught lies on all of us. We have the weapon to make this happen in front of us. Elections. If we want to throw it in Vajpayee's face that Indianness doesn't mean Hindutva, then we need to reject BJP everywhere, both in our states and in the entire country.

Source:
Translated By Sudhamshu Mitra, Primary Editor, Sneha Visakha
Translated to English from Kandahage
Volume 1, Page 133, Lankesh Prakashana (2012).

সূচিপত্র

ASK RATIONALISTS

প্রশ্নোত্তর পর্ব



প্রশ্ন:

বামপন্থী ঘরানার ইতিহাসবিদ রা এখন একটু অন্যরকম বললেও চিরকাল ইসলামিক আগ্রাসন এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন এগুলোর সাথে ধর্মের যোগ নেই। কিন্তু ইসলামী ইতিহাসকার রাই বলেছেন যেমন তামীম আনসারী যে তুর্কী সুলতান নিজেদের বেশী মুসলিম প্রমান করার জন্য এত অত্যাচার করেছে। যেখানে আরব রা সেভাবে কোনো জাতির ওপর অকারণ আগ্রাসন চালায়নি। বামপন্থীরা এই ক্ষেত্রে সিলেক্টিভ কেন? আমি বলে রাখি আমি বামপন্থার অনেক বিষয়ের সাথে একমত কিন্তু ইসলামী আগ্রাসন নিয়ে নীরবতায়

রাজি হতে পারিনা। আবার চীন যখন উইঘুর দের ওপর অত্যাচার করে সে নিয়েও চুপ(except CPIML Liberation). এই প্যারাডক্স বুঝতে পারিনা।

অভিজিৎ ভট্টাচার্য

বৈদ্যবাটি, হুগলি

উত্তর:

"আপনার প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রসঙ্গের দিকে আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। মার্কসবাদী চিন্তাভাবনার উপর ভিত্তি করে এর উত্তর দেওয়ার যথাসম্ভব চেষ্টা করছি। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে বামপন্থী ঘরানা একটা বেশ বড় স্পেকট্রাম। সেই কারণে এই ঘরানার ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিও বিভিন্ন রকমের, সেটা ভারতের প্রসঙ্গেই হোক বা বিশ্ব প্রসঙ্গে। বামপন্থী ইতিহাসবিদরা কতটা সিলেকটিভ বা কতটা নয় সেই প্রশ্ন আপাতত মুলতুবি রেখে আসুন বরং ভাবা যাক ইসলামিক আগ্রাসনের সাথে ধর্মের কোনো যোগ আছে কিনা। ইসলামিক আগ্রাসন এক প্রকার ধর্মীয় মৌলবাদ। যে কারণে ধর্মীয় মৌলবাদ আর ধর্মকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়, ঠিক সেই কারণেই ইসলামিক আগ্রাসন আর ইসলাম ধর্মকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয় বলেই মনে হয়। ধর্ম একটা অযৌক্তিক ধারণা বলে একজন নিপাট সাদামাটা ধার্মিক মানুষের সাথে হিংস্রতায় পরিপূর্ন রক্তপিপাসু মৌলবাদীদের একই পর্যায়ভুক্ত

হিসাবে বিবেচনা করাটা মার্ক্সবাদ অনুযায়ী অনুচিত বলেই মনে হয়।

মার্ক্সবাদ একটা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন। প্রতিটা সমস্যার আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ না করে সেটাকে হঠাৎ আবির্ভূত হিসাবে দেখাটা আর যাই হোক মার্ক্সবাদ সম্মত নয়। ধর্ম একটা ভাববাদী ধারণা। সমাজে শ্রেণীবিভাগের উৎপত্তির সাথে সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে, সেই শ্রেণী বিভাগকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে। নিতান্তই প্রতিক্রিয়াশীল একটা ধারণা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্ক্স স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে এ হলো সর্বহারা শ্রেণীর দীর্ঘশ্বাস, কারণ ধর্ম ছাড়া তার কাছে আকড়ে ধরার জন্য আর কিছু নেই। তাই মার্ক্সবাদ অনুযায়ী অর্থনীতি হলো ভিত্তি, আর ধর্ম হলো উপরিকাঠামো। শোষক শোষিতের ভিতরকার অর্থনীতিক সম্পর্কের বৈপ্লবিক বদল না ঘটিয়ে ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়, ক্ষেত্রবিশেষে কিছু সংস্কার ঘটতে পারে মাত্র। এখানে বিপরীতে তথাকথিত নাস্তিকদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো ধর্মের ভিত্তিটাকে অগ্রাহ্য করে ধর্ম ও ধার্মিক দুইয়ের বিরোধিতা করে যাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই এতে যে তারা আরো বেশি জন বিচ্ছিন্ন হন সেটা তারা বুঝতে চান না। নিজেদের ধর্মবিরোধী আধুনিক হিসাবে দেখিয়ে তারা কিছু সুখ অনুভব করতে পারেন মাত্র। সমাজ বদলের লড়াইতে সেই সুখ খুব একটা কাজে আসে না।

এবার আসা যাক মৌলবাদের কথায়। একটা নির্দিষ্ট আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে আধুনিক মৌলবাদের উদ্ভব। যে ইসলামিক আগ্রাসন দিয়ে কথা শুরু হয়েছিল সেখানে ফেরত আসা যাক। এই আগ্রাসন আসলে যত না ধর্মীয় তার থেকে বেশি বরং সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে কাজ করা একটা শক্তি, যার সাথে সাধারণ ছা-পোষা মানুষের রোজকার ধর্মচর্চার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। যে সম্পর্কটা আছে সেটা হলো ক্রমাগত ধর্মীয় উসকানি মারফত একটা সাধারণ মানুষকে তার মৌলিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে দেওয়া, যাতে সে কোনোভাবেই সাম্রাজ্যবাদের বা পুঁজিবাদের বিরোধিতার জায়গায় না চলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারকে প্রথম থেকে কারা তোষামোদ করেছিল? - আমেরিকান ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা। কোন উদ্দেশ্যে? - কমিউনিজম-এর "সংক্রমণ" যেন তাদের ভূখণ্ডে না চলে আসে! একইভাবে ঠান্ডা যুদ্ধের সময় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা মধ্য এশিয়ায় ইসলামিক মৌলবাদী শক্তিকে তৈরি ও লালন করেছিল কোন উদ্দেশ্যে? - রাশিয়াকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে। যদিও রাশিয়াও তখন আরেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত। ইসলামি মৌলবাদ বলতে আজকে আমরা যা বুঝি সেটা আসলে এই দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বন্দ্বের একটা প্রোডাক্ট। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ন্যারেটিভ অনুযায়ী লাদেন তখন গণতন্ত্রপ্রেমী জাতীয়তাবাদী, যে রাশিয়ান আগ্রাসনের মোকাবিলা করছে। কয়েক দশক পরে সেই ন্যারেটিভটাই আবার চেঞ্জ হয়ে গেল নতুন চাওয়া

পাওয়ার হিসাবে। পৃথিবীতে তখন একটাই সুপার পাওয়ার। ইসলামি আগ্রাসন নিয়ে আমাদের প্রজন্মের বেশিরভাগ ধারণা আসলে এই পোস্ট-২০০১ ন্যারেটিভ থেকেই তৈরি হয়েছে, যেখানে "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"-র নামে গোটা বিশ্ববাসীর চোখে ঠুলি পড়িয়ে একতরফা সন্ত্রাস চালিয়ে গেছে কিছু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। পাশাপাশি মৌলবাদী সন্ত্রাসকেও ইন্ধন যুগিয়ে গেছে। কারণ অস্ত্র বিক্রির জন্য চাই যুদ্ধ। শত্রু ছাড়া যুদ্ধ হয় না। আর শত্রু না থাকলে শত্রু তৈরি করে নিতে হয়!

আজকের দিনে চিন-ও একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সে তার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের স্বার্থে সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিমদের উপর অত্যাচার করে। যে মার্ক্সবাদী দর্শন সমস্ত জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করে সেই দর্শন অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের প্রতি এই অত্যাচার নিন্দনীয়। কিন্তু মার্ক্সবাদকে ধর্মমতে পরিণত করে ফেলা অনেক বামপন্থীদের হ্যাংওভার এখনও কাটেনি। তাদের কেউ কেউ বর্তমান চিনকে সাম্যবাদী মনে করেন, তাই সংখ্যালঘুর উপর অত্যাচারের বিষয়টা চেপে যান। অনেকে এমনকি বর্তমান রাশিয়াকেও সাম্যবাদী মনে করেন, এবং ফলত রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেন আক্রমণকে সমর্থন করে ফেলেন অদ্ভুত কিছু অজুহাতে। প্রসঙ্গত বলতে ইচ্ছা করছে, একদা মার্ক্সকেও তিতিবিরক্ত হয়ে বলতে হয়েছিল যে - এই যদি মার্ক্সবাদ হয় তাহলে আমি মার্ক্সবাদী নই। আজ বেঁচে থাকলে উনি নিঃসন্দেহে আবার এই কথাই বলতেন।

সুতরাং, ইসলামি আগ্রাসন/মৌলবাদ বা অন্য যেকোনো ধর্মের মৌলবাদ, বা তুর্কি কর্তৃক আগ্রাসন, বা কোনো আরব জাতির নিরপেক্ষ অবস্থান - আজকের দিনে সবই আসলে সেই স্থানের ভৌগলিক-রাজনৈতিক হিসেব নিকেশ, যায় সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে কোনো না কোনো সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ, সেটা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ-ও হতে পারে, আবার এক কালের সমাজতন্ত্রী, কিন্তু পরে পুঁজিবাদী প্রত্যাবর্তন হওয়া রাশিয়া চিনের সাম্রাজ্যবাদ-ও হতে পারে। একথা একেবারেই ঠিক যে বামপন্থীরা মাঝে মাঝে নিজেদের ক্যাম্প অনুযায়ী সিলেকটিভ হয়ে পড়েন, সেটা কোনোভাবেই সমর্থন যোগ্য নয় এবং সেটা মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণও নয়। তবে হ্যাঁ, এককথায় আমিও মনে করি যে ইসলামি আগ্রাসনের সাথে ধর্মের যোগ নেই, বরং সাম্রাজ্যবাদীদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। মার্ক্সবাদীদের উচিত আরও বেশি করে সেই যোগটাকে প্রকাশ্যে আনা এবং সেটার আলোকে ইসলামি আগ্রাসন বা যেকোনো রকম মৌলবাদী আগ্রাসনের বিরোধিতা করা।

ধন্যবাদ। উত্তর একটু বড় হয়ে যাওয়ার জন্য দুঃখিত। আপনার মতামত জানাবেন।”

উত্তরটি দিয়েছেন
কিনোক্ষ্যাপা

সূচিপত্র

| প্রশ্ন করুন এই গুগল ফর্মে – Ask_Rationalists

এবারের সংখ্যায় প্রায় **১০টি** প্রশ্নের উত্তর বাকি থাকল সেগুলো পরের সংখ্যায় বেরোবে।

ত্রুটি সংশোধন: গত সংখ্যায় একটি লেখা **'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর - রামকৃষ্ণ, একটি 'অসফল' সাক্ষাৎকার'** – অভিষেক দে' লেখকের নাম 'অভিষেক দে' হিসেবে গেছে, লেখকের নাম হবে **অভিষেক ঘোষ।**

ম্যাগাজিনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ছবিঋণ পিন্টারেস্ট ও ইন্টারনেট মাধ্যম।

সবাইকে ধন্যবাদ।

চেতনার অন্বেষণে

মাসে একটি লেখা

মুক্তচিন্তার ওপর লেখালেখি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে দেখে পত্রিকাটি শুরু করেছিলাম।

আপনারা যারা মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ, নাস্তিকতার চর্চা করেন যেমন পারবেন, যতটুকু পারবেন লিখুন। ফেসবুক, ব্লগ ইত্যাদি মিডিয়ায় লেখা প্রকাশ করার পাশাপাশি লেখাটি পাঠান।

পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য যুক্তিবাদীদের লেখালেখিতে উৎসাহিত করা, এবং মুক্তচিন্তকদের চিন্তাধারা সমাজে তুলে ধরা।

প্রচলিত অর্থে ম্যাগাজিনের জন্য লেখা বলতে গুরুগম্ভীর, বড়, সাধারণ লেখার থেকে একটু আলাদা, কিংবা সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ এরকম বুঝি, কিন্তু আমরা যে ধরনের লেখা চাই তা এরকম হতেই হবে এমন মোটেও নয়। কোন সাম্প্রতিক ঘটনা বা কোন বিষয়ে আপনার চিন্তা-ভাবনা কী সে সম্পর্কে ৫-১০ লাইন লিখলেও পাঠানো যায়। আমরা চাই আপনার লেখনী চলতে থাকুক। লেখায় নিজের পরিচয় গোপণ রাখতে চাইলেও অসুবিধা নেই, আপনার লেখা প্রকাশ করব। যা দুই বাংলার অগনিত মানুষের কাছে আমাদের ভাবনা ছড়িয়ে পড়বে এবং মুক্তচিন্তকদের আরও সংঘবদ্ধ করতে উৎসাহিত করবে।

এমন নয় যে আপনার লেখাটি কোথাও প্রকাশ করেছেন বলে দেওয়া যাবে না, তা একেবারেই নয়। ক্রমশ অসহনীয় রাজনৈতিক দিনগুলিতে যুক্তিবাদীরা কোণঠাসা হচ্ছে। তাদের নিজেদের জন্য হলেও কলম তুলে নিতে হবে এটি নির্মম সত্য। কোন প্রকার প্রশ্ন এবং লেখা পাঠানোর ঠিকানা- yuktibadira@gmail.com

জানুয়ারি সংখ্যা সংগ্রহ করুন

পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হোন (বিনিময়মূল্য ছাড়াই)

পত্রিকার গ্রাহক হতে ফর্ম পূরণ করুন- Cilck Here | Scan QR

যো গা যো গ

Email: yuktibadira@gmail.com

